আর্যদের অনুসন্ধান

রামশরণ শর্মা

অনুবাদক • ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

আর্যদের অনুসন্ধান

রামশরণ শর্মা

অনুবাদক
ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট :: কলকাতা-৭৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

ডি. টি. পি. প্রিন্ট
ইউনিক লেসার সিস্টেম
8, কুমুদ ঘোষাল রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৭

৬০.০০ টাকা মাত্র
(Rupees Sixty only)

ISBN : 81-86383-42-5

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ, ১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

প্রাক্-কথন

১৯২৩-এ গর্ডন চাইল্ড তাঁর 'আর্য' গ্রন্থে আর্য-সমস্যার সমাধানে যে প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সম্প্রতিকালে তা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসভূমি সম্পর্কে ডজন খানেকেরও বেশি তত্ত্ব গড়ে তুলতে এবং তাঁদের ভ্রমণ পথ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত উপস্থাপিত করতে প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। এই পুস্তকখানিতে অবশ্য সমস্যাটির সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলি প্রধান বিবেচ্য। এখানে আর্য-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ নিশানাগুলিকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এই নিশানাগুলির 'কখন' ও 'কোথায়' আলোচিত হয়েছে। অশ্বের ও অর-যুক্ত চাকার ব্যবহার, মৃতের সৎকার, অগ্নি ও সোম-বিশ্বাস, পশুবলিদান বিশেষতঃ অশ্বমেধ, জীবিকার উপায় এবং পুরুষ-প্রাধান্য, এগুলি এখানে বিচার করা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া ও গ্রীসে প্রাপ্ত লেখগুলিতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে-নমুনা পাওয়া যায়, তাও এখানে টেনে আনা হয়েছে। এই গবেষণা যদি আর্য-সমস্যা সম্পর্কে নবজাগ্রত আগ্রহকে বজায় রাখতে সহায়ক হয়, আমি সুখী হব।

১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে কেরালায় ত্রিপুনিথুরার রাজা শ্রীরাম বর্মা সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে আমি পরীক্ষিত স্মরক বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বর্তমান পুস্তিকা তারই বিস্তৃততর সংস্করণ। যিনি বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর কে. জি. পৌলসকে ধন্যবাদ জানাই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ মৃত্যুঞ্জয় কুমার এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিকাল রিসার্চ-গ্রন্থাগারের ড. পি. এন. সহায়কেও ধন্যবাদ দিই। এই পুস্তিকাখানি রচনায় যে-সব উপাদান ব্যবহার করেছি, তার চিত্র অনুকৃতি করে পাঠিয়েছেন ওঁরা উভয়েই।

পাটনা

আর. এস. শর্মা

নভেম্বর ৭, ১৯৯৪

অনুবাদকের নিবেদন

অধ্যাপক রামশরণ শর্মা নিজের হাতে দিয়েছিলেন বইটা Looking for the Aryans। এটি তাঁর পরীক্ষিৎস্মৃতি বক্তৃতা। এই বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন কেরালায় ত্রিপুনিথুরার শ্রীরাম বর্মা গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে। পুস্তক খানি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, এর একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। লক্ষ্য হল প্রমাণ করা যে, আর্যদের আদি বাসভূমি সিন্ধুনদের উপত্যকায় ছিল না। ভারতীয় আর্যরা ইরাণ থেকে আগত। ইন্দো-আর্য ও ইন্দো-ইরাণীয় উভয়েই ইন্দো-ইউরোপীয়দের বংশধর, যাদের সংস্কৃতি পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচনাটি পরিবেশিত হয়েছে। সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে লেখকের প্রধান বিচার্য অশ্বের ব্যবহার, পশুবলি, অগ্নি-পূজা, সোম-পানীয়ের ব্যবহার, মৃতের সংকার, পুরুষ-প্রাধান্য, পশুপালনের সঙ্গে কৃষি, শিকার ও মাছ ধরা এবং তা ছাড়া বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে তামা ও লোহার উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহার। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতির বিচার করা হয়েছে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এই পুস্তিকাখানি বাঙ্গালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় অধ্যাপক শর্মা রাজী হয়ে যান। অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হল যে, কাজটি মোটেই সহজ নয়। যত তাড়াতাড়ি কাজটা হবে ভেবেছিলাম, বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, যাঁদের উদ্দেশ্যে এই অনুবাদ, সেই সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে কতটা উপকৃত হবেন, তা বলা শক্ত। কারণ, প্রত্নতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞান না থাকলে অনেক জায়গায়ই খুব দুরূহ বলে মনে হতে পারে। তা ছাড়া, লেখক পাঠকের কাছে আরও একটি বিষয় আশা করেন, তা হল মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে প্রাথমিক জ্ঞান। যাই হোক, তবু বাংলায় অনুবাদ করা বিফল হবে না এই কারণে যে, লেখকের মূল বক্তব্য পাঠকের বোঝা দুঃসাধ্য হবে না। এছাড়া, যাঁরা মনে করেন, ইতিহাসের মানে হল রাজনৈতিক ইতিহাস, তাঁদের ধারণা পাল্টাতে পারে। তাঁদের হয়ত এই বোধের সৃষ্টি হবে যে, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস আর সংস্কৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে ভাববাদে নয়, বস্তুতান্ত্রিকতায়।

অনুবাদের উপরোক্ত উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, অনুবাদ সার্থক হয়েছে। তবে এ দাবি করি না, সর্বত্র ভাষা যথেষ্ট সাবলীল হয়েছে। অনিবার্য্য করতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, যাতে সাবলীল অনুবাদ করতে গিয়ে এমন স্বেচ্ছাচারিতা না হয় যে, লেখকের বক্তব্য বিন্দু মাত্র ভুল বোঝার অবকাশ থাকে। পরিভাষাগত অসুবিধাও দেখা গেছে। যাই হোক, বাঙ্গালী পাঠকদের বৌদ্ধিক অনুশীলনে এই পুস্তিকা কিছুমাত্র সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচী

মানচিত্র ৭-৮
উত্তর ইউরেশিয়ায় অর-যুক্ত চাকার প্রাপ্তিস্থান; উত্তর ইউরেশিয়ায় গৃহপালিত অশ্বের প্রাপ্তিস্থান

১. ভূমিকা ৯-১৫
'আর্য' সম্পর্কিত ধারণা; প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন

২. অশ্ব-বিষয়ক সমস্যা ১৬-২৬
গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত উল্লেখ; খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পূর্বে ভারতে গৃহপালিত অশ্বের অনুপস্থিতি; নীপার ও ভল্গার মধ্যবর্তী দেশে প্রাচীনতম পশুপালন; রথের ভাষাতাত্ত্বিক উল্লেখ; চক্র ও অর [স্পোক] সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি; আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ভারতে ও উত্তর-পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশে অশ্ব; গাঙ্গেয় উপত্যকায় অশ্বের প্রত্নতত্ত্ব; গাঙ্গেয় উপত্যকায় যান-চক্র ও অর; অশ্ব ও অ-ইন্দো-ইউরোপীয়; অশ্ব ব্যবহারের গুরুত্ব

৩. ভাষা ও লৈখিক প্রমাণ ২৭-২৯

৪. আর্যদের আচার-অনুষ্ঠান ৩০-৩৯
পশুবলি; অশ্বমেধ; অগ্নিবেদী; সোমে-বিশ্বাস; মৃতের সৎকার

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক ৪০-৪২
পুরুষ-প্রাধান্য; অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

৬. উপসংহারের দিকে ৪৩-৪৭
আর্য ও হরপ্পা সংস্কৃতি; সারকথা

টীকা ও তথ্যনির্দেশ ৪৮-৫৮
গ্রন্থপঞ্জী ৫৯-৬৪

উত্তর ইউরেশিয়াতে অর-যুক্ত রথচক্রের প্রাপ্তিস্থান

Scale : 1 : 72,000,000 (1cm = 720 km)

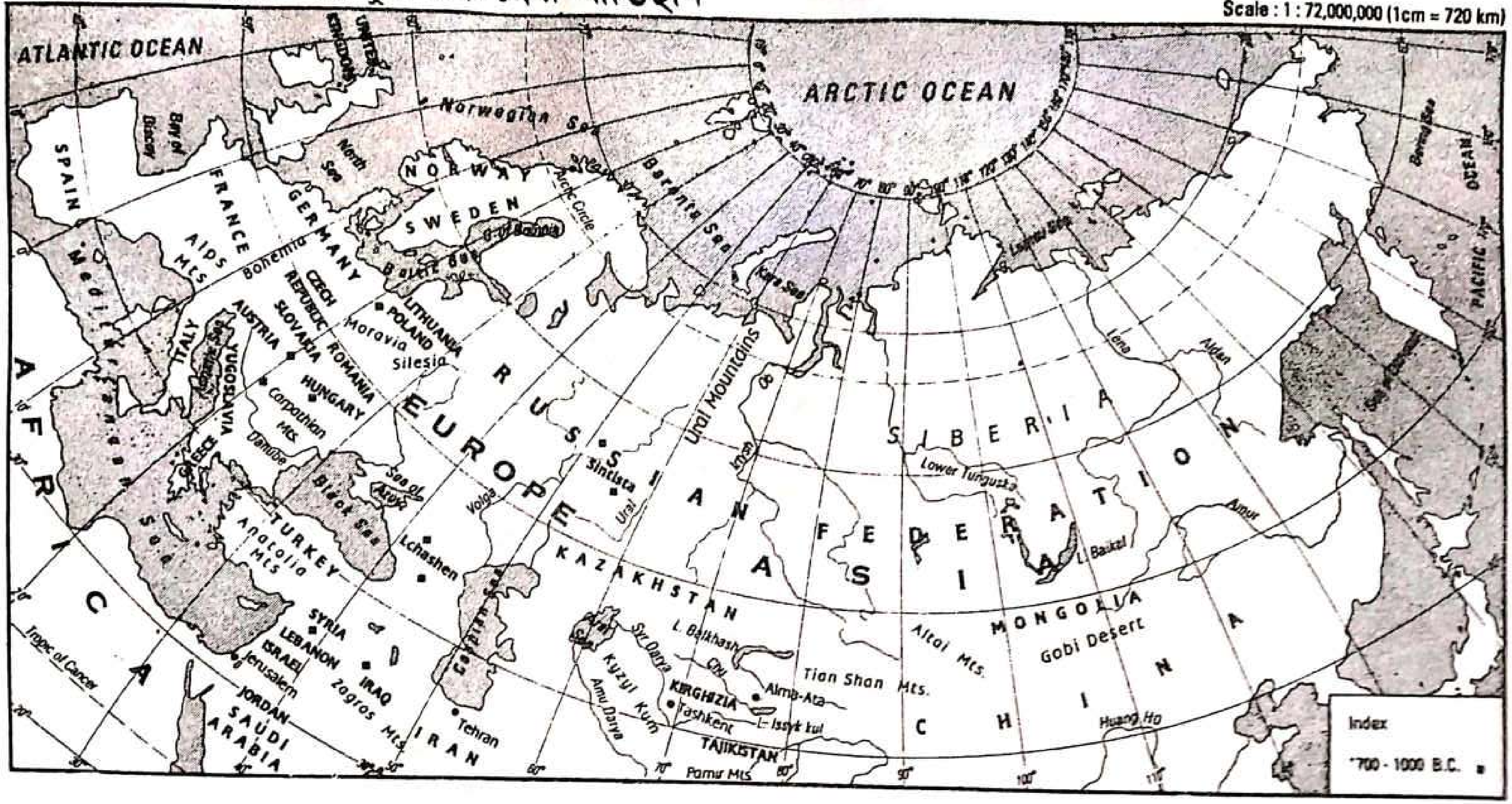

উত্তর ইউরেশিয়াতে গৃহপালিত অশ্বের প্রাপ্তিস্থান

Scale : 1 : 72,000,000 (1cm = 720 km)

১. ভূমিকা

'আর্য' সম্পর্কিত ধারণা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে, যখন উইলিয়াম জোন্‌স্‌ আবিষ্কার করেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা সদৃশ, তখন এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয় যে, আর্যরা মধ্যএশিয়া অথবা পূর্ব ইউরোপে বাস করতেন। ধরে নেওয়া হয়, তাঁরা একই নরগোষ্ঠীর বংশধর ছিলেন। এই ধারণা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এবং নাৎসি জার্মানীতে ইহুদি-বিরোধী অভিযানে হিটলারের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৩৩-এর পর এই ঘোষণা করা হয় যে, জার্মানরাই বিশুদ্ধ আর্যজাতি। নাৎসি দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জার্মানরা আর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী এবং কাজেই পৃথিবীতে প্রভুত্ব করার অধিকার তাদের। কিন্তু যে-সব পণ্ডিত আর্য-সমস্যা নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে গবেষণা করেছেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একই ভাষাভাষী যাঁরা, তাঁরা একই নরগোষ্ঠী বা জাতিভুক্ত হবেন, এমন কোনও কথা নেই। অধিকাংশ পদ্ধতি বর্তমানে এক ও অভিন্ন নরগোষ্ঠীর দিক থেকে ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এক আদিরূপের কথা বিবেচনায় রত।

ইন্দো-ইউরোপীয় সমস্যার আলোচনায় কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয়দের 'আর্য' বলা হয়, যদিও 'আর্য' শব্দটি প্রধানতঃ প্রাচ্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দেখা যায়। এই শব্দটির দ্বারা **আবেস্তা** ও **ঋগ্‌বেদ** যে-সংস্কৃতির অংশীদার তাকেই বোঝায়। 'ইন্দো-ইরাণীয়' ও 'ইন্দো-আর্য', এই শব্দ দুটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ইন্দো-ইরাণীয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয় পার্থক্য বর্জিত সেই ভাষাকে বোঝাতে, যে'ভাষায় কথা বলতেন অবিভক্ত ভারতীয় ও ইরাণীয়দের নিয়ে গঠিত আর্য জাতি। তা ছাড়া 'ইন্দো-ইরাণীয়' দ্বারা বোঝায় ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্যদের সংযুক্ত গোষ্ঠী। আবার, 'ইন্দো-ইরাণীয়'কে কেবলমাত্র ইরাণের ভাষা বিবেচনা করা হয়, এবং সেই ভাষা-ভাষীরাই ইন্দো-ইরাণীয়। যাইহোক, আমরা এই শব্দটি বিস্তৃততর অর্থে ব্যবহার করি এবং ভারতীয় ভাষা ও ভারতীয়দের এর অন্তর্গত বলে মনে করি। 'ইন্দো-আর্য' শব্দটির দ্বারা বোঝায় ভারতের ভাষা ও সেই ভাষাভাষীদের। কখনও কখনও 'আদিভারতীয়' শব্দটি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'ইরাণীয়' ও 'ভারতীয়', শব্দ দুটির ব্যবহারে বিভ্রান্তি রয়েছে কিছুটা। প্রথমটির দ্বারা ইরাণে আগত আর্যদের সূচিত করে, এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা বোঝায় সংস্কৃত ও তার ভাষাভাষী, যাঁরা ভারতে এসেছিলেন। আবার, 'আদি ইন্দো-আর্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয় ক্যাসাইট ও মিতান্নি লেখাবলীর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে বোঝাতে। আর একটি শব্দ, 'আদি ইন্দো-ইরাণীয়' ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাকে বোঝাতে, যে ভাষায় কথা বলত ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয়েই, যখন তারা একসঙ্গে

বাস করত বলে ধরে নেওয়া হয়। 'আদি ইন্দো-ইউরোপীয়' শব্দটির দ্বারা বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে প্রাপ্ত সগোত্র শব্দগুলির ভিত্তিতে নির্মিত ভাষাকে বোঝায়।[১]

'আর্য' শব্দটি অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় না পাওয়া গেলেও কতকগুলিতে পাওয়া যায়। 'আর্য' শব্দ-কেন্দ্রিক সব যুক্তিতর্ক বিচার করে ও. জেমেরেনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় নয়, নিকট প্রাচ্যের, সম্ভবতঃ উগরির মত ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ, যার অর্থ হল 'আত্মীয়' অথবা 'সঙ্গী'।[২] যাইহোক, 'আর্য' শব্দটি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচ্যশাখার প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও আবেস্তা, উভয় গ্রন্থেই এটি পাওয়া যায়। 'ইরাণ' শব্দটিই 'আর্য' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছুকাল ইন্দো-আর্য ও ইরাণীয় আর্যরা আফগানিস্তানে বাস করত বলে এই দেশের একটি আঠ 'অরইয়' বা 'হরইব' নামে পরিচিত হয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের রাজা দারিয়াস নিজেকে আর্য বলে অভিহিত করেন। ঋগ্বেদে 'আর্য' শব্দটির দ্বারা একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে বোঝায়। ইন্দো-আর্য ও ইন্দো-ইরাণীয়, উভয় ভাষাতেই যারা কথা বলত, তাদের আর্য বলা হয়। আবেস্তাতে সেই আর্য-দেশের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে জরথুস্ত্রের ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল। এর দ্বারা বোঝাতে পারে ক্লাসিকাল লেখকদের বিবরণে উল্লেখিত 'আরিয়া' বা 'আরিয়ানা'। আফগানিস্তান, পারস্যের একাংশ ও মিডিয়া নিয়ে গঠিত এক বৃহৎ এলাকাকে এর দ্বারা বোঝাত। তাছাড়া এর অন্তর্গত ছিল ব্যাক্ট্রিয়ার কতকাংশ ও তার উত্তরে অবস্থিত সোগডিয়া। ভারতের সন্নিহিত দেশগুলির অধিবাসী তিনটি জনগোষ্ঠীর একটিকে 'আরিয়ানোয়াস' বলে উল্লেখ করেছেন মেগাস্থিনিস।[৩] হিট্টাইট ভাষায় 'আর্য' শব্দটি আছে এবং সেখানে তার অর্থ 'আত্মীয়' বা 'বন্ধু'। কোনও কোনও পণ্ডিত আয়ার্ল্যাণ্ডের নামের সঙ্গেও 'আর্য' শব্দটির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। 'আর্য' শব্দটির সগোত্র একটি শব্দ জার্মান ভাষাতেও আছে, কিন্তু অন্য কোনও পশ্চিম শাখার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় নেই।

ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজে যাঁরা অশ্ব ও রথের মালিক ছিলেন, তাঁরাই সমাজে প্রভুত্ব করতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করা সঠিক হবে না যে, সব অবস্থাতেই 'আর্য' শব্দটির অর্থ 'প্রভু' বা 'অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি'। ফিনিসিয় ভাষায় 'ওর্‌জ' শব্দের অর্থ দাস, এবং এই শব্দটি 'আর্য' থেকে উৎপন্ন। মনে হয়, যখন ফিনল্যাণ্ডবাসী তাদের প্রতিবেশী ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যদের পদানত করেছিল, তখন তারা নিজেদের ভাষায় 'ওর্‌জ' শব্দটি দাসকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করত।[৪]

ঋগ্বেদে ইন্দ্র-উপাসকদের আর্য বলা হত। যখন এই গ্রন্থে একদিকে আর্য আর অন্যদিকে দাস ও দস্যুদের মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তখন প্রথমোক্তকে স্বদেশী ও দ্বিতীয়কে বিদেশী বিবেচনা করা হয় নি। এই যুদ্ধ হয়েছে দুইটি সংস্কৃতির মধ্যে, একটিতে ব্রত পালিত হয় এবং অন্যটিতে ব্রত লঙ্ঘিত হয়। সেই স্তরে ভারতকে এক দেশ বা জাতির দৃষ্টিতে দেখা হয় নি, এবং সেকারণে 'স্বদেশী' ও 'বিদেশী'

নামে চিহ্নিত করার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইরাণ উভয় দেশেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনধারার মধ্যে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবেস্তার গাথা-অংশে দেখানো হয়েছে, ইরাণে দ্বন্দ্ব চলেছিল জরথুস্ত্র-পন্থী ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে।

'যদি গাত্রবর্ণ পরিচয়-নির্দেশক বিবেচিত হয়, তবে ঋগ্‌বেদের কতকগুলি সূক্তে আর্যদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে দেখান হয়েছে। তাদের শত্রুদের কৃষ্ণবর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্যদের বলা হয়েছে মানুষী প্রজা, যারা অগ্নি-বৈশ্বানরের পূজা করত এবং কখনও কখনও কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের গৃহে গৃহে আগুন জ্বালিয়ে দিত।[৫] কথিত আছে, আর্যদেবতা সোম কৃষ্ণবর্ণ লোকদের হত্যা করতেন।[৬] এও বলা হয়েছে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসদের[৭] সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ৫০,০০০ 'কৃষ্ণ' (বর্ণ) কে নিহত করেছিলেন। বিশ্বাস করা হয়, তিনি অসুরের কৃষ্ণ চর্ম[৮] অপসারিত করেছিলেন। এই জাতীয় উল্লেখে আর্য ও তাদের শত্রুরা গাত্রবর্ণের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বেইলি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঋগ্‌বেদে 'আর্য' শব্দের সব উল্লেখ জাতি বা বর্ণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না। মূল 'অর্' থেকে নিষ্পন্ন এই শব্দটির অর্থ হল 'পাওয়া'।[৯] আবেস্তায় 'আর্য' শব্দের অর্থ প্রভু অথবা অভিজাতকুলের ব্যক্তি, এবং এই অর্থে ঋগ্‌বেদের কতকগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই, ঋগ্‌বেদে বৈদিক যুগের যে-সব গোষ্ঠীপতি 'আর্য' আখ্যা দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন, তাঁরা ছিলেন হয় সম্পদশালী অথবা উচ্চকুল-সম্ভূত। স্পষ্টতঃ পশুপালন সমাজে তাঁদের সমৃদ্ধির কারণ ছিল পশু-সম্পদের মালিকানা, আর ওই সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল অশ্বের মালিকানা-যুক্ত অভিজাততন্ত্রের পক্ষে।

ঋগ্‌বেদে জাতিগত দিক থেকে কয়েকটি মিশ্র গোষ্ঠী দেখা যায়। দশ জন রাজা বা বিশ্‌পতি বিখ্যাত 'দশরাজার যুদ্ধে' অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে আর্য গোষ্ঠীপতিরা অনার্য নেতাদের মুখোমুখী হন নি। নামের তালিকা থেকে জানা যায়, প্রত্যেক যুযুধান পক্ষে আর্য ও অনার্য, উভয়ই ছিল। পরে, যাঁরা সম্মানিত ও উচ্চপর্যায়-ভুক্ত অথবা অভিজাতকুলোদ্ভূত, তাঁরা আর্য নামে পরিচিত হন। পরবর্তী বৈদিক ও বৈদিকোত্তর কালে 'আর্য' শব্দটির দ্বারা উচ্চতর তিনবর্ণকে বোঝাত, যাঁদের 'দ্বিজ' নামেও অভিহিত করা হয়। শূদ্রদের কখনই আর্যদের পর্যায়-ভুক্ত করা হয় নি। আর্যদের স্বাধীন বলে মনে করা হত। অপরদিকে, শূদ্ররা স্বাধীন ছিল না। কৌটিল্যের মতানুসারে আর্যপ্রাণ শূদ্রকে দাস পর্যায়ে অধঃপতিত করা যেত না, কারণ আর্যত্বম্ বা আর্যভাব ছিল তার মধ্যে সহজাত। অতএব, আর্যত্বম্ একপ্রকার নাগরিক স্বাধীনতাকে বোঝাত। এর অর্থ, যে শূদ্রদের পিতামাতা আর্য তাঁরা স্বাধীন বলে গণ্য হতেন। গুপ্তযুগ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা বেশি ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা যখন সংখ্যাধিক্য অর্জন করেন, তখনও ব্রাহ্মণ ও সমাজের অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণী তাঁদের অনার্য বিবেচনা করত।

প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গঠিত হয় তার থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে এবং সেই আদর্শ ভাষা থেকে একটি আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীরা যে জলবায়ু, ভূ-চিত্র, পশু-পাখীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত সগোত্র শব্দাবলী থেকে। ঐ শব্দগুলি থেকে তাঁদের জনপদনিবেশ, সমাজের গঠন, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা সম্বন্ধেও জানা যায়। এমিল বেনভেনিসতে সগোত্র শব্দ সমষ্টির ভিত্তিতে ইন্দো-ইউরোপীয়দের সামাজিক নিয়ম-বিধির উৎপত্তি, বিবর্তন এবং এমনকি রূপান্তর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন।[১০] কিন্তু আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গঠন ও সেই ভাষা থেকে আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি অনুমান করার পদ্ধতিকে কেউ কেউ সমালোচনা করেন ; এঁদের মধ্যে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ কলিন রেনফ্রু আছেন।[১১] যুক্তি দেখানো হয়, কালক্রমে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় অ-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দ গৃহীত হতে পারত। কিন্তু এই সব সমালোচনার যথেষ্ট বিরোধিতা হয়েছে। ভাষাতত্ত্বে শব্দের পূর্বাপর অর্থের পার্থক্য করা যায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ চিহ্নিত করা সম্ভব। সগোত্র শব্দগুলির মর্মার্থের বিভিন্ন স্থান-কালে পার্থক্য হয়েছে কিনা, তা বিবেচ্য। কিন্তু এ পর্যন্ত আদি ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দগুলির বিকল্প অর্থ নির্দিষ্ট করা হয় নি। সেইজন্য শব্দের পরবর্তী কালের প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে পূর্ববর্তীকালে ব্যবহৃত শব্দার্থ ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, প্রাচীন কালের যে-সব আচার-অনুষ্ঠান বর্তমান যুগে টিঁকে রয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রাচীনকালে সেইসব আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কেমন ছিল বিচার করা হয়। আবার, ভাষার অবয়ব কেবল পৃথক পৃথক শব্দগুলির ভিত্তিতে নয়, এক গুচ্ছ পরস্পর সম্পর্কিত শব্দের অবলম্বনে তৈরি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলি এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যায়। পরিশেষে, যদি ভাষার ধ্বনি, অঙ্গসংস্থান ও বাক্যে পদবিন্যাস সংক্রান্ত সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে তা হবে ভাষাগত সম্বন্ধ ও জাতিত্বের সঠিক ইঙ্গিত। এক্ষেত্রে, ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্যগুলি বিভিন্ন সমকেন্দ্রিকতার গুণ হিসেবে আরোপিত হতে পারে না।

সেই কারণে, কোনও মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলির সগোত্র শব্দগুলিকে বেছে নিয়ে তার ভিত্তিতে আদি ভাষাটিকে পুনর্গঠিত করা ন্যায়সঙ্গত। ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি রোমান্স ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে প্রচলিত ল্যাটিন ভাষা গঠন করা হয়েছে। পুরাতন গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত ল্যাটিনের সঙ্গে তুলনা করে এই পদ্ধতির যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে। যাইহোক, ল্যাটিন অথবা আদি-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে, এই রকম ভাষা-গঠনপদ্ধতিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি প্রভৃতি জীবনের সব দিকগুলি অনুমান করা সম্ভব নয়।

আদি-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও উৎপাদন-অর্থনীতি সম্বন্ধীয় শব্দগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়, যেহেতু ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত বস্তুগত সংস্কৃতির সাক্ষ্য দ্বারা পরীক্ষা করে নেওয়া যায়। তাছাড়া, আদি-ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ কেবলমাত্র সগোত্র শব্দগুলির ভিত্তিতে করলে চলবে না; **ঋগ্বেদ, আবেস্তা,** হোমারের মহাকাব্য প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রাচীনগ্রন্থগুলি থেকে সংস্কৃতির যে সাধারণ উপাদানগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিরও বিবেচনা করতে হবে।

অবশ্য, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পুনর্নির্মাণের কতকগুলি অসুবিধা আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাখার মধ্যে 'বৃক্ষ'-সম্বন্ধীয় সাধারণ শব্দ মাত্র ছয়টি, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূর্জপত্রবৃক্ষ। পশু-সম্পর্কিত শব্দের সংখ্যাও সীমিত। সমস্যা হল কিভাবে এই (শব্দের) অভাব পূরণ করা সম্ভব।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সগোত্র শব্দ-সমষ্টি ও প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্যে জানা যায় নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, পশুপালন ও কৃষিকার্য, ধাতুর ব্যবহার, আরোহণ ও রথবহনের জন্য অশ্বের ব্যবহার, পুরুষ-প্রাধান্য, শব-দাহের পর সমাধি, অগ্নি ও সোম-উপাসনা, পশুবলি, যার অন্তর্গত অশ্বমেধ, এবং সর্বোপরি এক সাধারণ ভাষার ব্যবহার। এই উপাদানগুলি সাধারণভাবে বৈদিক ও আবেস্তীয় রচনাবলীতে আছে এবং এর অধিকাংশই পাওয়া যায় অন্যান্য প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিতে।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী গ্রীস, ইরাণ ও ভারতের সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগে প্রসারিত করা সুযুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি বলে মনে হয় না। কিন্তু মূলতঃ **ঋগ্বেদ, আবেস্তা** ও হোমারের গ্রন্থাবলী সেই যুগের, যে-যুগে প্রধানতঃ তামার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যদিও হোমারের রচনাগুলির শেষদিকে লোহার উল্লেখ আছে, সাধারণ ভাবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পশুপালন ও কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নব্যপ্রস্তরযুগের শেষদিকে ও ব্রোঞ্জযুগে পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশুপালন ও কৃষি পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। যাই হোক, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় গ্রন্থাদিতে ব্রোঞ্জযুগের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা' ক্রীট, মেসোপোটেমিয়া ও হরপ্পার সংস্কৃতির মত উন্নত ছিল না। পূর্বোক্ত ব্রোঞ্জযুগে ছিল না নগরী, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা। খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের আগে লোহার কার্যকর ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না।

উপরোক্ত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি যে-ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করেন, তার অন্তর্গত ছিল পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া। এই অঞ্চল ভারত, আফগানিস্তান, ইরাণ, ইরাক, আনাতোলিয়া ও গ্রীসের কম-বেশি প্রসারিত রূপ। অতি প্রাচীনকাল থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাস ছিল এই অঞ্চলে। তাছাড়া, সগোত্র শব্দসমষ্টি থেকে জ্ঞাত জলবায়ু, উদ্ভিদ ও

পশুপাখীর সঙ্গে এই অঞ্চল যুক্ত হ'তে পারে। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-এর পূর্ববর্তী কালের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানাদির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির সন্ধান যুক্তি-সম্মত পদ্ধতি বলে মনে হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান অনুসন্ধান-ব্যপদেশে, তার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশ, পশ্চিম এশিয়া এবং এমন কি চীনের স্থায়ী বসতিগুলির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিশানাগুলি এককভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করা উচিত সেই অঞ্চল, যেখানে ওই সব নিশানা একসঙ্গে রয়েছে এবং সুসঙ্গতিপূর্ণ সাংস্কৃতিক সত্তা গড়ে তুলেছে। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যএশিয়ার যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তামা, অশ্ব ও অন্যান্য উপাদান দেখা যায়, তার আয়তন সুবৃহৎ ; এবং ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি উপরোক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন উপবিভাগে একই সময়ে পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে নি। সেইজন্য, প্রসারের স্তর ও কারণগুলি এবং সেই সঙ্গে মধ্যবর্তী অগ্রগতিতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানগুলির বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন অবশ্যই। সাংস্কৃতিক নিশানাগুলির 'কখন' ও 'কোথায়' এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয়।

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির স্থান ও কাল অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন পুরাণকথা ও লোকগাথা আমরা আলোচনায় আনি নি। সগোত্র শব্দ-সমষ্টি ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হয় কিনা তা দেখার চেষ্টা আমরা করেছি।

ইন্দো-ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব মৃতপাত্রাদির দ্বারা কিঞ্চিৎ ভারগ্রস্ত। ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র ইন্দো-ইরাণীয়দের আর চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র ভারতীয় আর্যদের। ধূসর বর্ণের পাত্রাদি পাওয়া যায় মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশ, ইরাণ, আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানে খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অথবা তারও পূর্বে।[১২] এইসব মৃৎপাত্র নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে যুক্ত, ভারতীয় উপমহাদেশে যার আবির্ভাব খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-এর পূর্বে ঘটেনি; ব্যতিক্রম বেলুচিস্তানে মেহেরগড়। এও সম্ভব যে, যখন ইন্দো-ইরাণীয় গোষ্ঠীগুলি মধ্যএশিয়ার দক্ষিণভাগে ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল, তারা এই জাতীয় পাত্রাদির ব্যবহার সুরু করেছিল এবং এমন কি যখন তারা হিন্দুকুশ অতিক্রম করে পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ ও রাজস্থানে বসতি করেছিল, তখনও তারা এই মৃৎপাত্রের ব্যবহার বজায় রেখেছিল।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল চারপ্রকার বা ততোধিক মৃৎপাত্র, যেমন কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ পাত্র, কৃষ্ণবর্ণের ছাপযুক্ত পাত্র, ধূসরবর্ণ পাত্র ও চিত্রিত ধূসর বর্ণ পাত্র। একইভাবে ইউরোপে খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ২৫০০

অব্দের মধ্যে চারপ্রকার মৃৎপাত্রের ব্যবহার যারা করত, তাদেরই ইন্দো-ইউরোপীয় বলে মনে করা হয়।[১৩] কিন্তু একমাত্র মৃৎপাত্রাদির ব্যবহারের ভিত্তিতে ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদিবাসভূমি বা বিভিন্ন বসতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় প্রধানতঃ সমাধিস্থানগুলির উৎখননের দ্বারা, যেমন ভারতে বৃহৎপ্রস্তর (মেগালিথ্)-সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপ ও মধ্যএশিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয়দের খুব কম বসতি চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ এই অবস্থা বিশেষ অসুবিধাজনক। কারণ, যদিও প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয়রা মৃতের সমাধি দেওয়ার প্রথা অনুসরণ করত, ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের সমাধিগুলির আবিষ্কার সোয়াট উপত্যকায় সীমাবদ্ধ।

২. অশ্ব-বিষয়ক সমস্যা

গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত উল্লেখ

ইন্দো-ইউরোপীয়দের জীবনে অশ্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; তাই, অশ্বকে ইন্দো-ইউরোপীয়দের উপস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 'অশ্ব' ও তার সমার্থক শব্দ পাওয়া যায় সংস্কৃত, আবেস্তীয়, ল্যাটিন, গ্রীক ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় গ্রন্থাদিতে অনেক ব্যক্তিগত নাম অশ্ব থেকে উদ্ভূত। এটি বিশেষ করে বেদ ও আবেস্তা সম্বন্ধে সত্য। "খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পূর্ববর্তী বৈদিক যুগে পঞ্চাশের অধিক অশ্বের নাম" ও তিরিশটি রথের নাম পাওয়া যায়।[১] হেরোডোটাসের দ্বারা উল্লেখিত ইরাণের কয়েকটি উপজাতির নাম অশ্ব-অনুসারী। এমন কি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ক্যাসাইটরা ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করেছিল,তাদের উপজাতীয় নাম অশ্ব-ভিত্তিক বলে মনে হয়। ঋগ্‌বেদে বিভিন্ন রূপে 'অশ্ব' শব্দটি রয়েছে ২১৫ বার আর 'গো' শব্দটি আছে ১৭৬ বার। ঋগ্‌বেদে সম্পূর্ণ দুটি সূক্তে অশ্বের প্রশস্তি করা হয়েছে[২] এবং এর গুরুত্ব আরও অসংখ্য উল্লেখ থেকে স্পষ্ট।[৩] বৈদিক দেবতাদের মধ্যে উঁচু স্থানে রয়েছেন যে অশ্বিনীদ্বয়, তাঁরা অশ্বারোহী। বৈদিক দেবতাদের প্রায় সকলেই অশ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইন্দ্র ও তাঁর সহচর যোদ্ধা মরুদ্গণের সম্পর্কে এটি বিশেষ ভাবে সত্য। অশ্ব বলের প্রতীক এবং সাধারণতঃ শক্তির রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বৈদিকযুগের মানুষেরা প্রজা ও পশুর জন্য যেমন, তেমনি অশ্বের জন্য প্রার্থনা করতেন; কখনও কখনও তাঁরা একসহস্র অশ্ব চাইতেন।

হোমারের[৪] রচনায় অশ্ব ও অশ্ববাহিত রথ সমান গুরুত্বপূর্ণ। ওডিসি[৫]-তে রাজকীয় অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়ক বা 'অশ্বপাল' শব্দটি প্রায়ই দেখা যায়। জেন্দ্ আবেস্তায় গবাদি পশু অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী মনে হলেও অশ্ব বা 'অস্পে'র সাধারণ গুরুত্ব লঘু করে দেখা যায় না। মিথ্র[৬] দেবতার প্রার্থনায় অশ্ব ও রথ বারবার উল্লেখিত। আরও কয়েকটি দেবতা অশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সূর্যকে সর্বদা দ্রুত অশ্বযুক্ত অথবা দ্রুত অশ্বের অধিকারী[৭] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক পরবর্তীকালে ভারতীয় মূর্তি-তত্ত্বে সূর্য্যের সপ্তাশ্ববাহিত রথ ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছিল। আবেস্তায় অপাম্ নপাত[৮] নামে আর এক দেবতার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'দ্রুত অশ্বযুক্ত' কথাটি। ইনি একজন বৈদিক দেবতাও বটেন। জোরোয়াসটার তরুণ রাজা বিতস্পকে আশীর্বাদ করেছেন, তিনি যেন অশ্ব-সমৃদ্ধ হন; আবার দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তাঁরা যেন রাজাকে দ্রুত অশ্ব ও বলবান সুপুত্র[৯] দান করেন। বিশেষ লক্ষণীয় যে, বিতস্প

নামে 'অস্‌প' (অশ্ব) যেমন একটি অংশ, তেমনি পৌরুসস্‌প (জোরোয়াস্টারের পিতা), করেসস্‌প, সুসতস্‌প ও গমস্‌প[১০] প্রভৃতি অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা যোদ্ধাদের নামের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ইরাণে শাসকগোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে অশ্ব এমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, ধর্মীয় বা ধর্ম ব্যতীত যে-কোনও অপরাধের শাস্তি দেওয়া হত অশ্বের চাবুক **(অসফে-অস্ত্র)**[১১] দিয়ে। **আবেস্তার** প্রাচীনতম অংশ **গাথায়** অবশ্য অশ্বের উল্লেখ খুবই কম। কিন্তু 'গাথা'র কয়েকটি খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে মাত্র এবং 'গাথা' যে বৃহত্তর গ্রন্থের অংশ তাও অসম্পূর্ণ।[১২] কোনও সন্দেহ নেই যে, সমগ্র **আবেস্তায় সাধারণভাবে অশ্ব,**[১৩] বিশেষ ভাবে রথবাহী অশ্ব[১৪] ও ভারবাহী অশ্ব[১৫] পরিচিত। অতএব, সাহিত্যগত প্রমাণাদি থেকে সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকে না যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নিকটবর্তী কালে মধ্যএশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও ইরাণ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ পর্যন্ত অশ্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পূর্বে ভারতে গৃহপালিত অশ্বের অনুপস্থিতি

খ্রীস্টপূর্ব ২০০০-এর পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে অশ্বের অস্তিত্বের কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই। খ্রীস্টপূর্ব ৪৫০০ নাগাদ[১৬] রাজস্থানে বেগর-অঞ্চলে গৃহপালিত অশ্বের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বেগর থেকে প্রাপ্ত পশু-তালিকায় অশ্বের উল্লেখ নেই[১৭]। বিন্ধ্যপর্বতে মহাগরের নব্যপ্রস্তর অঞ্চলে অশ্ব পরিচিত ছিল। কিন্তু "একে সংযুক্ত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, ইরাণ, আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী এবং আর্যদের সঙ্গে যুক্ত এক স্বতন্ত্র প্রজাতির অশ্ব বলা হয়।"[১৮] তাছাড়া, রেডিও-কার্বন পদ্ধতিতে ঐ অঞ্চলের সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত প্রসারিত। কাজেই এই রহস্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বেলুচিস্তানের রানা ঘুণ্ডল[১৯] থেকে অশ্বের সংবাদ পাওয়া গেছে এবং তার সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ অনুমিত হয়। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অশ্ব ঐ যুগের হওয়া সম্ভব নয়।[২০] এটি বিশেষ অর্থবহ যে, হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলে উৎকীর্ণ ও টেরাকোটার যে-সব পশুমূর্ত্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে অশ্ব অনুপস্থিত। অন্যদিকে, বৃষ-মূর্তি প্রায়শই চিত্রিত[২১], তারপরেই দ্বিতীয় স্থান হস্তীর। মনে হয়, প্রাক্‌-বৈদিক সংস্কৃতিতে বৃষ-পূজা প্রচলিত ছিল। সিন্ধুসভ্যতায়[২২] চিত্রিত বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম ককুদ-যুক্ত বৃষ। যাইহোক, বেলুচিস্তানের তাম্র-প্রস্তর প্রত্নস্থলগুলিতে[২৩] টেরাকোটা-নির্মিত বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে বহু সংখ্যায়। **ঋগ্‌বেদে** যে বৃষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তার দেবত্ব আরোপিত হয়েছে সম্ভবতঃ বৈদিক জন-জাতির সঙ্গে হরপ্পার অধিবাসীদের যোগাযোগের ফলে। যাইহোক না কেন, সম্ভবতঃ লোথাল[২৪] ব্যতীত অন্যকোনও হরপ্পীয় প্রত্নস্থলে অশ্বের টেরাকোটা-মূর্তি পাওয়া যায় না। লোথালে প্রাপ্ত অশ্বমূর্তি পরিণত হরপ্পা-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নয়।

নীপার ও ভল্‌গার মধ্যবর্তী দেশে প্রাচীনতম পশুপালন

খ্রীস্টপূর্ব ২০০০-এরও আগে পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে গৃহপালিত অশ্ব দেখা যায়, যদিও গর্দভ সম্বন্ধে এই তথ্য প্রযোজ্য নয়। যাইহোক, তৃণভূমি অঞ্চলে অধিক সংখ্যায়, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ অথবা বলকান অঞ্চলে অতি অল্পসংখ্যায় অশ্ব দেখা যায়। খ্রীস্টপূর্ব ২০০০-এর আগে গ্রীসে অশ্বের আবির্ভাব হয়নি। বলকান উপদ্বীপের কয়েকটি স্থানে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে অশ্বের নমুনা পাওয়া যায়। এর কারণ সম্ভবতঃ কৃষ্ণসাগরের অশ্ব-অধ্যুষিত এলাকার সঙ্গে যোগযোগ। আনাতোলিয়াতেও অশ্ব দেখা যায়। মধ্য ও উত্তর ইউরোপে অতিপুরাতন অশ্ব-অস্থির নমুনা পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু আসলে ওগুলি অন্যান্য বন্য পশুর অস্থির নমুনাও হতে পারে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল এই যে, সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় অশ্বের দেখা মেলে যেখানে সেই অঞ্চলটি যা পশ্চিমে নীপার নদী ও পূর্বদিকে ভলগা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে[২৫] দক্ষিণ উরাল অঞ্চলে সর্বপ্রথম অশ্বের আবির্ভাব দেখা যায়। মরিজা গিম্বুতাসের মতানুযায়ী, ভল্গার তৃণ-ভূমিতে যারা মেষপালক ছিল, তারাই "প্রথম অশ্ব পালন সুরু করে",[২৬] যদিও খ্রীস্টপূর্ব ৬০০০ নাগাদ কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল থেকেও অশ্বের নমুনা প্রাপ্তির সংবাদ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় অধিক সংখ্যায় অশ্বের দেখা পাওয়া যায়। তবে মনে হয়, আদি-ইন্দো-ইউরোপীয়দের সময়কালে গৃহপালিত অশ্বের আদি বাসভূমি ছিল কৃষ্ণসাগর ও দক্ষিণ উরালের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

কৃষ্ণসাগরের অদূরবর্তী হওয়ায় পশ্চিম এশিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত আনাতোলিয়ায় খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে অশ্বের উপস্থিতি দেখা যায়। যদিও খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সুরুতে দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণে এলামাইট লিপি ও খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে[২৭] সুমেরীয় লিপিতে অশ্বের চিত্ররূপ আছে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দে, পশ্চিম এশিয়ার জীবনে এই পশুটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নি। যাই হোক, মনে হয় ইরাণে অবস্থিত সিয়াল্ক(৩য়)[২৮] এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানে অবস্থিত মুন্দিগকে[২৯] এই পশুটি পরিচিত ছিল। স্পষ্টতই অশ্বের ব্যবহার এক দীর্ঘ সম্ভাবনার যুগের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। যদিও আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০০-তে এটি পরিচিত ছিল, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০-তে সাধারণ ভাবে এর ব্যবহারের সূত্রপাত হয়েছিল।

রথের ভাষাতাত্ত্বিক উল্লেখ

অশ্ববাহিত রথের ব্যবহার ইন্দো-ইউরোপীয়দের বৈশিষ্ট্য ছিল। তার প্রমাণ মেলে বৈদিক, আবেস্তীয় ও হোমারিয় রচনাবলীতে। পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাজপেয়-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে রথ-প্রতিযোগিতার বিধান দেওয়া হয়েছে; এটি একটি গ্রীক-প্রথাও[৩০] বটে এবং

হোমার[৩১] তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন। ধরা হয়, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে পশ্চিম এশিয়ায় রথের উৎপত্তি হয় এবং একই সহস্রাব্দে দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমিতে পৌঁছে যায়। এটি সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে, কারণ তৃণভূমিতে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বা আনুমানিক ঐ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত রথ আবির্ভূত হয় নি। যাইহোক, এটি অর্থপূর্ণ যে, আদি ইউরোপীয়রা চক্রযুক্ত শব্দের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিল। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে রথের দুটি প্রতিশব্দ আছে এবং প্রতিটি শব্দ প্রায় ছয়টি আদি-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রথের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। চক্রনেমী, অশ্বের সাজপোষাক এবং রথের মধ্যদেশ (বসবার জায়গা) প্রভৃতির সমার্থক শব্দ ছয়টি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রয়েছে। অনেক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রথারোহণ-জ্ঞাপক ক্রিয়াবাচক একটি অভিব্যক্তিও আমরা পাই।[৩২] রথের যোয়াল চাপানোর অর্থবহন করে এমন ক্রিয়াপদ হিট্টাইট ও সংস্কৃত ভাষায় আছে। আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় চক্র ও শকটের জন্য দুটি ভিন্ন শব্দ আছে।[৩৩] যদিও ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পর্কের মাধ্যমে নিকট প্রাচ্য থেকে ইন্দো-ইউরোপীয়রা ঐ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করে থাকতে পারে, এটি তৃণভূমির জীবনযাত্রায় এমনভাবে অঙ্গীভূত হয়েছিল যে কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এর ব্যবহার দেখা যায়।

চক্র ও অর [স্পোক] সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি

দক্ষিণ রাশিয়ায় খননকার্যের ফলে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ থেকে সুরু করে রথের অস্তিত্বের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের দুই বা চার চক্রযুক্ত রথ পাওয়া গেছে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২০০০ পর্যন্ত এই সব চক্রের অধিকাংশই নিরেট করে তৈরি হত। সেই কারণে, যতদিন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা একসঙ্গে বাস করত, ততদিন তারা অরের (স্পোক্) সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বিভিন্ন দিকে বিস্তার ও তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির পর তারা অর-সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। দক্ষিণ উরালে সিনতস্ত নদীতীরে আনুমানিক ১৭০০ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টপূর্বের একটি সমাধিস্থলে হাল্কা যুদ্ধ রথের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই রথের প্রত্যেকটি চক্রের দশটি অর আছে। সেইসব রথের অশ্বগুলির দেহাবশেষ পাঁচটি কবরে পাওয়া গেছে।[৩৪] আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে পূর্ব ইউরোপে অর-যুক্ত রথচক্র দেখা যায়। কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী লচ্যাসেনে প্রাপ্ত টিলাগুলিতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে দুটি চক্রযুক্ত রথ আছে এবং প্রতিটি চক্রের ২৮টি অর আছে। অবশ্য খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত চক্রগুলিতে সাধারণতঃ মাত্র চারটি অর ছিল।[৩৫] ক্যাসাইটরা সর্বপ্রথম ব্যাবিলনিয়াতে অর-যুক্ত চক্রের প্রবর্তন করেছিল। পরে, যখন মিতান্নিরা উত্তর সিরিয়াতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন এই অঞ্চলে তারা অর-যুক্ত চক্র ব্যবহার করত। লেখের সাক্ষ্যে এই সব অর-যুক্ত চক্রের তারিখ

নির্দিষ্ট করা হয় খ্রীঃ পূঃ ১৩৮০-তে, যদিও উত্তর সিরিয়াতে তারা প্রবেশ করেছিল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে।

ক্রমশঃ ভারী নিরেট চক্র ও যুদ্ধ-রথের পরিবর্তে প্রচলন হল হাল্কা চাকার ও তেজীয়ান ঘোড়ায় টানা দুইচাকা-ওয়ালা ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ী। ধীরগতি বৃষ বা মাঝে মধ্যে উট-বাহিত চার-চাকার অসুবিধাজনক গাড়ির বাস্তবিকই কোনও প্রয়োজন ছিল না।[৩৬]

মনে করা হয়, অর-যুক্ত চক্রের ব্যবহার ইন্দো-ইউরোপীয়দের বৈশিষ্ট্য নয়। ইন্দো-আর্য অথবা ইন্দো-ইউরোপীয়দের পূর্ব শাখার আগমনের পূর্বেই আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৬০০-তে পশ্চিম এশিয়ায় অর-যুক্ত চক্রের আর্বিভাব হয়েছিল।[৩৭] কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, খ্রীস্টপূর্ব সপ্তদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আদি-ইন্দো-আর্যদের আবির্ভাবের পূর্বে ঘোড়ায় টানা রথ-ভিত্তিক যুদ্ধ প্রচলিত ছিল না।[৩৮] ইতিপূর্বে পশ্চিম এশিয়া থেকে অরের ব্যবহার পৌঁছে গিয়েছিল তৃণভূমি-অঞ্চলে এবং এগুলি বহুসংখ্যায় আবার দেখা গেল, যখন ইন্দো-ইউরোপীয়দের পূর্বশাখা এখানে আবির্ভূত হল। হরিয়ানায় মিতাহালে হরপ্পীয় সংস্কৃতি-স্তরে পোড়ামাটির তৈরি অর-অঙ্কিত চক্র আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া গেছে।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ভারতে ও উত্তর-পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশে অশ্ব

খ্রীঃ পূঃ ২০০০-এর পরই মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে, আফগানিস্তান ও মধ্যএশিয়ার পূর্ব দিকে অশ্বের ব্যবহার বিস্তার লাভ করেছিল। খ্রীঃ পূঃ সপ্তদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় অশ্ব-ব্যবহারের যথেষ্ট সাক্ষ্য আমরা পাই লেখমালায়। ক্যাসাইটরা ব্যাবিলনে তাদের রাজ্যের অধিকার অশ্ব ও রথ ব্যবহারের মাধ্যমেই পেয়েছিল। যখন ব্যাবিলনিয়রা প্রথম অশ্ব দেখেছিল, তখন তারা এর নাম দিয়েছিল বিদেশী বা পার্বত্য গর্দভ, কারণ তারা গর্দভই চিনত। এতে আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভারতে ব্যবহৃত মহিষের সমার্থক বৈদিক শব্দ। যদিও **ঋগ্বেদে মহিষ** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ঐ গ্রন্থে **গো** (গরু) থেকে উৎপন্ন **গৌর** ও **গৌরী** শব্দ দুটিও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশে, ইরাণ ও আফগানিস্তানে কয়েকটি স্থানে খননকার্যের ফলে অশ্বের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব দেহাবশেষের সময়কাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। এই অব্দের মাঝামাঝি সময়ে অশ্ব ও রথের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে কিরঘিজিয়া, আলতাই অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া, পামীর পর্বতমালা এবং সর্বোপরি দক্ষিণ তাজিকিস্তানে।[৩৯]

ভারতীয় উপহমাদেশে অশ্বের দেহাবশেষ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। ঐ সব দেহাবশেষের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে রিচার্ড মীডো যুক্তি দেখিয়েছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে[৪০] অশ্বের উপস্থিতির সাক্ষ্য রূপে অস্থি[৪১]-গত কোনও নিদর্শন নেই। তাঁর মতে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রকৃত অশ্বের অস্তিত্বের প্রাচীনতম

সাক্ষ্য মেলে বেলুচিস্তানের পিরাক অঞ্চলে এবং তার সময়কাল খ্রীঃ পূঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নয়।[৪২] ইন্দো-ইউরোপীয়দের জীবন ছিল অশ্ব-কেন্দ্রিক এবং তারা অশ্ব-সম্পর্কিত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান করত। কিন্তু এ কথা পরিণত হরপ্পীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। যা কিছু প্রমাণ পাই, তা হরপ্পীয় যুগের শেষ দিকে। হরপ্পা-সংস্কৃতির অবসানের পর বেলুচিস্তানে গুমলায় একটি ভারবাহী অশ্বের পোড়ামাটির প্রতিকৃতি দেখা যায়।[৪৩] আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, খ্রীঃ পূঃ ১৮০০০ ও ১৩০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালে এবং তার পরেও বেলুচিস্তানের কচি-সমতলে অশ্বারোহণের সাক্ষাৎ মেলে। এই সমতলের পিরাক অঞ্চলে[৪৪] একই সময়কার পোড়ামাটির তৈরি অশ্বারোহীর প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। পাকিস্তানে[৪৫] কারাকোরম পার্বত্য অঞ্চলে চিলাস অঞ্চলে অশ্বের উপস্থিতির কথা জানা যায়। পাকিস্তানে[৪৬] সোয়াত উপত্যকায় গন্ধার সমাধি-সংস্কৃতির অন্তর্গত কবরগুলিতে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের অশ্ব ও তার সাজসজ্জার নিদর্শন পাওয়া যায়। একই উপত্যাকায় ঘালিগাই নামক স্থানে অশ্বের উপস্থিতির সাক্ষ্য মেলে।

বেলুচিস্তানের কচি-সমতলভূমিতে অশ্বের উপস্থিতিকে উত্তরে সোয়াত উপত্যকায়[৪৭] অশ্ব-দেহাবশেষের আবিষ্কারের সঙ্গে শুধু নয়, সুরকোতদাতে যে-সব আবিষ্কার হয়েছে, তার সঙ্গেও সম্পর্কিত করা যেতে পারে। সুরকোতদাতে খ্রীঃ পূঃ ২১০০ থেকে ১৭০০ সময়কালের দ্বারা চিহ্নিত নিম্নতম স্তরে অশ্বের অস্থির নমুনা পাওয়া যায়।[৪৮] সুরকোতদাতে প্রাপ্ত অশ্ব পিরাকের অশ্বের সমসাময়িক হতে পারে। রাজকোট থেকে প্রায় ১০০ কিমি দূরে কুন্‌তসিতে হরপ্পীয় স্তরে যে অশ্ব-অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ২২০০ ও ১৯০০ এর মধ্যবর্তী।[৪৯] সুরাটের[৫০] মালয়ালেও একটি অশ্ব-অস্থি পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, রোপার ও লোথালে যে অশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেছে, তা হরপ্পীয় সংস্কৃতির শেষ স্তরে সীমাবদ্ধ।[৫১] এ পর্যন্ত অশ্ব-দেহাবশেষ অথবা অশ্বের পোড়ামাটির প্রতিকৃতি হরপ্পায় সাম্প্রতিক কালে (১৯৮০-৯৩) অথবা ঢোলবীরাতে[৫২] খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নি। রংপুরে অশ্বের পোড়ামাটির প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।[৫৩] লোথালে অশ্বের উপস্থিতি অতিরঞ্জিত করা হয়।[৫৪] যদিও এই প্রত্নস্থলে সংস্কৃতির এক উত্তরণ-পর্ব উন্মোচিত হতে দেখা যায়। এই পর্বে পরবর্তীকালের হরপ্পীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।[৫৫] স্পষ্টতঃ হরপ্পীয় সংস্কৃতির পরিণত পর্যায়ে অশ্বের অস্তিত্বের কোনও সাক্ষ্য নেই বললেই চলে। নিদর্শনের যে-দৃষ্টান্তগুলি পাওয়া গেছে সে-গুলি হরপ্পীয় যুগের শেষ দিকের অর্থাৎ ১৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের, যে-সময়ের মধ্যে বৈদিক যুগের জন-জাতিগুলি উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসতি করে ফেলেছিল।

সোয়াত উপত্যকায়, গন্ধার ও ঘলিগাই সমাধিস্থলে এবং হরিয়ানায় ভগবানপুরায় অশ্ব-অস্থির আবিষ্কারের সঙ্গে উত্তর ভারতে অশ্বের প্রসারের ঘটনা প্রাসঙ্গিক। কুরুক্ষেত্র

জেলায় অবস্থিত ভগবানপুরায় এমন এক সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে হরপ্পার পরবর্তী স্তরের সঙ্গে চিত্রিত ধূসর পাত্রের স্তর পরস্পরকে প্রাবৃত করেছে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৩০০-১২০০ অব্দের এই প্রাবরণ-স্তরে অশ্ব-অস্থিসমুদয় পাওয়া গেছে।[৫৬] স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রাপ্ত উপাদানগুলি গন্ধারের আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত। খ্রীঃ পূঃ ১ম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়কার হস্তিনাপুরে[৫৭] প্রাপ্ত চিত্রিত ধূসর পাত্রের স্তরেও অশ্ব-অস্থি পাওয়া গেছে। উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে চিত্রিত ধূসরপাত্রের স্তরগুলিতে[৫৮] অশ্ব ও বৃষের পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া যায়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা সহসা ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে নি। অশ্ব ও রথ সম্পর্কে তারা অবহিত হলেও তাদের বিস্তারে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানায় ইরাণ, আফগানিস্তান ও মধ্যএশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে তাদের বিস্তার হয়েছিল আনুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূঃ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ ও তারও পর পর্য্যন্ত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অশ্ব ও রথের ব্যবহার তাদের দ্রুত গতি দান করেছিল। একথা ভাবা শক্ত যে, হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ ধরে ভারতে রথগুলি প্রবেশ করেছিল। অবশ্য,আরোহী-যুক্ত অশ্ব সে-কাজ সহজেই করতে পারত।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সংস্কৃতিতে চক্রযুক্ত শকটের আবির্ভাব হয়। কিন্তু হরপ্পীয়রা যে অর-যুক্ত চক্রের ব্যবহার জানত, এমন কোনও ইঙ্গিত নেই। এই রকম চক্র এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অবশ্য, একটি খেলনা-গাড়ির চাকায় অর চিত্রিত দেখা যায়।[৫৯] ঢোলবীরা থেকে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির চাকায় অর-জাতীয় নক্শা অঙ্কিত দেখা যায়। ওই উপাদানটি পঞ্চম স্তর[৬০] অথবা হরপ্পীয় সংস্কৃতির শেষ দিকের। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার পর হরপ্পা-সংস্কৃতিতে অর আবির্ভূত হয়েছিল।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় অশ্বের প্রত্নতত্ত্ব

বৈদিক সংস্কৃতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, পূর্বতন ও পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থাদি থেকে অশ্বের ব্যাপক ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগ ও বৈদিকোত্তর কালে গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে অশ্বের প্রসারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে। কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলে কুরুক্ষেত্র জেলার[৬১] ভগবানপুরায় এবং মীরাট জেলায়[৬২] হস্তিনাপুরে অশ্ব-অস্থি সমুদয় পাওয়া যায়। ইটা জেলায় অত্রঞ্জিখেরায় চিত্রিত ধূসর পাত্র ও তার পরবর্তী স্তরে[৬৩] অশ্ব-অস্থি দেখা যায়। তদুপরি চিত্রিত ধূসর পাত্র-স্তরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির খেলনাগুলির মধ্যে রয়েচে বৃষ ও অশ্ব।[৬৪] হস্তিনাপুরে[৬৫] পাওয়া যায় স্থূলভাবে গঠিত কতকগুলি মূর্তি যে-গুলিকে সম্ভবতঃ অশ্ব ও বৃষ বলে অনুমান করা যায়।

উত্তর ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় অসংখ্য স্থানে উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্রাদি-স্তরে অশ্ব ও হস্তী সহ বিভিন্ন প্রকার পোড়ামাটির পশুমূর্তি পাওয়া যায়। হস্তিনাপুরে[৬৬] ও অত্রঞ্জিখেরা[৬৭], উভয় স্থানেই উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্রাদি যুগের মধ্যবর্তী স্তরে পাওয়া যায় পোড়ামাটির আকৃতি বিশিষ্ট অশ্ব। কয়েকটি অশ্ব ও হস্তিমূর্তির উপর আরোহী দেখা যায়।[৬৮] গৃহপালিত অশ্বের ব্যবহার যে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম থেকে উত্তর ও পূর্বদিকে বিস্তারলাভ করতে পারে, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। উত্তরকাশী জেলায় পুরোলাতে চিত্রিত ধূসর পাত্র যুগের একটিমাত্র স্তরে গৃহপালিত অশ্বের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায়।[৬৯]

গোরখপুর জেলায় নরহানে খ্রীঃ পূঃ ১০০০-৮০০ সময়কালের দ্বারা চিহ্নিত প্রথমযুগে এক বৃহৎ অশ্ব জাতীয় জন্তুর অস্থি পাওয়া গেছে ও যদিও স্পষ্ট জানা যায় না, জন্তুটি বন্য অথবা গৃহপালিত।[৭০] দ্বিতীয় যুগের একটি পোড়ামাটির অশ্বের মূর্তি লোহার ব্যবহারের তথ্য প্রকাশ করে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণপাত্রের[৭১] ব্যবহারের তথ্য জানা যায় না। এটির সময়কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৯০০-৭০০।[৭২] যাইহোক, নরহানের সময়কাল অন্ততঃ ২০০ বৎসর পূর্ববর্তী বলে মনে হয়, কারণ এর 'তৃতীয় খ-যুগের' মধ্যবর্তী স্তরের দুটি নমুনার রেডিও কার্বন তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৩০০-এর পূর্বেকার নয়![৭৩] এর 'তৃতীয় যুগের' তারিখ হবে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০, যখন 'দ্বিতীয়' যুগের অবসান ঘটেছিল। অশ্বের উপস্থিতির প্রাচীনতম স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বালিয়া জেলায় খৈরাদি নামক স্থানে, যার সময়কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০।[৭৪] রাজঘাটে উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্রাদি স্তরে (খ্রীঃ পূঃ ৫০০-২০০) অশ্ব ও অন্যান্য বন্য ও গৃহপালিত কয়েকটি পশুর দেহাবশেষ পাওয়া যায়।[৭৫] বারানসী জেলার প্রহ্লাদপুরে প্রাপ্ত অশ্বের পোড়ামাটির মূর্তিগুলির সময়কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অর্থাৎ প্রত্নস্থলটির মধ্যবর্তী যুগের।[৭৬]

খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ থেকে সুরু করে গৃহপালিত অশ্ব মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার এক বৃহৎ অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। রাজঘাট,[৭৭] প্রহ্লাদপুর, বক্সার,[৭৮] বৈশালী,[৭৯] চিরান্দ,[৮০] সোনপুর,[৮১] পাটলিপুত্র,[৮২] চম্পাতে[৮৩] উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্রাদি স্তরে পোড়ামাটির অশ্ব পাওয়া গেছে। চম্পাতে অশ্ব-আকৃতি বিশিষ্ট দুটি প্রস্তর-নির্মিত ছাঁচ পাওয়া গেছে।[৮৪] পাটলিপুত্রের অধিবাসীদের মধ্যে অশ্ব জনপ্রিয় ছিল।[৮৫] কে. কে. সিনহা মনে করেন, উত্তরপ্রদেশের প্রত্নস্থলগুলিতে খ্রীঃ পূঃ ৫০ থেকে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ[৮৬] পর্যন্ত খ্রীঃ পূঃ ৩০০-৫০ সময়কালের তুলনায় অধিক সংখ্যায় অশ্বমূর্তি পাওয়া যায়।

অশ্ব দ্রুতগতির প্রতীক এবং সেই কারণে তাকে রথের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাকে বলা হয় 'আশু'। বলা বাহুল্য, 'আশু' 'অশ্বে'র সঙ্গে সম্পর্কিত।[৮৭] তাই দক্ষিণ-পূর্বদিকে বৈদিক ঔপনিবেশিকদের অগ্রগতিতে এই পশুটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছিল। এই সব ঔপনিবেশিকরা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথে বিভক্ত হয় সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার সীমানা থেকে ও উত্তরগাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় যান-চক্র ও অর

উপমহাদেশের এক বিশাল অংশে হরপ্পীয় যুগে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যানে নিরেট চাকা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হত।[৮৮] হরপ্পীয় যুগে সাধারণতঃ প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর চাকা'বেরিলি জেলায় অহিচ্ছত্রতে চিত্রিত ধূসর পাত্র স্তরে দেখা যায়।[৮৯] কিন্তু বিহারের পাললিক সমতল ভূমিতে, তারাদি[৯০] ও সোনপুরে তাম্র-প্রস্তরযুগের চক্র প্রায় অনুপস্থিত এবং চিরান্দে[৯১] নব্যপ্রস্তর-তাম্রপ্রস্তর যুগে বিরল। তবে খ্রীস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বৃহদায়তন প্রস্তর যুগের (মেগালিথিক) সংস্কৃতিতে অশ্ববাহিত রথ ব্যবহৃত হত।[৯২]

উৎস যাই হোক না কেন, উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্রের যুগে মধ্য গাঙ্গেয় প্রত্নস্থলগুলিতে খেলনা গাড়ীতে চাকা দেখা যায়। এতে মনে হয়, নিরেট ও অরযুক্ত চাকা সে-যুগে ব্যবহৃত হত। মাটির তৈরি নিরেট চাকা পাওয়া যায় উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণপাত্রাদির প্রাচীনতর স্তরগুলিতে, অন্যদিকে অর-যুক্ত চাকা দেখা যায় অত্রঞ্জিখেরায়[৯৩] ঐ যুগের একেবারে শেষ দিকে। সোনপুর,[৯৪] পাটলিপুত্র[৯৫] ও বৈশালীতে[৯৬] প্রাপ্ত পোড়ামাটির জিনিষপত্র থেকে চক্রযুক্ত শকটের অস্তিত্ব অনুমিত হতে পারে। চিরান্দ,[৯৭] সোনপুর,[৯৮] তারাদি[৯৯] ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির খেলনা-গাড়ী এবং তার ভগ্নাংশগুলি থেকে গাড়ীর সাধারণ ব্যবহার অনুমান করা যায়। ছাপ-যুক্ত পেটাই মুদ্রা ও লেখহীন ঢালাই তাম্রমুদ্রায় চক্র প্রতীক চিহ্ন রূপে দেখা যায়।[১০০]

মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় লৌহব্যবহারের যুগের সংস্কৃতিতে চাকা ও গাড়ীর ব্যাপক ব্যবহারের পাশাপাশি বিচার্য্য তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিতে এসবের প্রায় অনুপস্থিতি। উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্র স্তরেও অর-যুক্ত কিছু চক্রের নমুনা পাওয়া যায়, যা পূর্ববর্তী যুগে দেখা যায় না। এগুলির আবির্ভাবের ফলে এল হাল্কা গাড়ী এবং আরও দ্রুত গতি। কাজেই, উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্রের যুগে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভারবাহী পশু-বাহনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যান-বাহন। কৌশাম্বী, ভিটা, সোনপুর প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের গোড়ার দিকের স্থানগুলিতে প্রাপ্ত উপাদানাদি থেকে মনে হয়, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ অথবা তৃতীয় শতাব্দী থেকে খেলনা-গাড়ীর আদর্শ সাধারণতঃ প্রচলিত হয়। বিশেষ অর্থপূর্ণ হল, মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় অশ্বের ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে যুক্ত ছিল পশুবলি ও মৃতের সমাধি এবং সর্বোপরি পাটলিপুত্র থেকে প্রচারিত অশোক-অনুশাসনে ব্যবহৃত আর্যভাষা সঠিক রূপ ধারণ করেছিল। এই সব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অশ্ব ও অর-যুক্ত চক্রের ব্যবহার বৈদিক সংস্কৃতিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল।

অশ্ব ও অ-ইন্দো-ইউরোপীয়

এই ধারণা সঠিক নয় যে, আর্যরাই অশ্ব, রথ, চক্র ও অর ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকারী ছিলেন। হিক্‌সোরা অশ্ব ও রথ ব্যবহার করতেন এবং তার ফলে খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে মিশর জয় করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। যদিও হিক্‌সোদের ইন্দো-ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত মনে করা হয়, তারা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষী ছিল, এমন কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। মধ্য-এশিয়া থেকে প্রাপ্ত এবং পামির পর্বত-গাত্রে খোদিত অশ্ব-বাহিত রথ আর্যদের সনাক্তকরার মত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয় না। এই কারণে যে, তৃণভূমিতে অশ্ব ও রথের সৃষ্টি হয় নি এবং খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এবং তারও পরে মিশর ও আনাতোলিয়া থেকে চীন পর্যন্ত এগুলি ব্যবহৃত হত।[১০১] কিন্তু তৃণভূমি অঞ্চলে অশ্বের আবির্ভাব হয়েছিল অনেক আগে। যদিও খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ ও ১২০০ এর মধ্যে চীনে অশ্ব ও রথ সাঙ্গদের দ্বারা ব্যবহৃত হত, আনাতোলিয়া অথবা চীন ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে কোথাও এই পশুটির উৎপত্তি হয় নি। চীন অথবা মিশরে পদার্পণের অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর এবং সম্ভবতঃ তারও আগে কৃষ্ণসাগর ও উরাল পর্বত অঞ্চলে গৃহপালিত অশ্বের আবির্ভাব হয়েছিল। স্থান ও কালের এই বিশাল ব্যবধানের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-এর মধ্যে অশ্ববাহিত রথ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের মধ্যে সীমিত ছিল না বটে, কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবে অন্যান্যদের চেয়ে ইন্দো-ইউরোপীয়দের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য হয়েছিল।

অশ্ব ব্যবহারের গুরুত্ব

গৃহপালিত অশ্বের আবির্ভাব মানব-ইতিহাসে এক বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে পরিবর্তিত হয়েছিল জীবনধারণা প্রণালী, যানবাহনের চরিত্র ও যুদ্ধ-পদ্ধতি। কৃষ্ণসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে, অশ্বমাংস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, এবং ঘোটক-ঘোটকী উভয়ই খাদ্যের জন্য হত্যা করা হত। তাছাড়া, অশ্বারোহণের দ্বারা এক বিস্তৃত এলাকায় মানুষের পক্ষে শিকার করা সম্ভব হয়েছিল এবং শিকার আগের চেয়ে অনেকে বেশি সফল হয়েছিল। কাজেই অশ্ব নিজেই ছিল খাদ্যের উৎস এবং অন্যান্য খাদ্য সরবরাহের উৎসগুলি উন্মুক্ত করেছিল। এই জন্তুটি চমকপ্রদভাবে কার্যক্ষেত্রের বিস্তার ঘটিয়ে ব্যবহারযোগ্য উপাদানাটির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করেছিল।

অশ্বের ব্যবহার যান-বাহনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে দূরপথ ভ্রমণে এবং ভারবাহী পশুরূপে জিনিষপত্র বহনে অশ্বকে কাজে লাগান যেত। সাধারণতঃ আরোহী-যুক্ত অশ্ব তৃণভূমিতে ৬০ থেকে ৭০ মাইল এবং সমতলে তার চেয়েও

বেশি প্রতিদিন ছুটতে পারত, আর ভারবাহী অশ্ব দৈনিক ১৫ থেকে ২০ মাইল পথ পরিক্রমা করত। পথচারীর তুলনায় অশ্বারোহীর গতি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অশ্বের প্রচণ্ড গতি ও দৈহিক শক্তি অশ্ব-ব্যবহারকারীদের যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল। পরবর্তী নব্যপ্রস্তর যুগ অথবা ব্রোঞ্জযুগে যারা অশ্বের ব্যবহার করত না, অথচ অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ ছিল, তারা অশ্ব ব্যবহারকারীদের দ্বারা সহজেই পরাজিত হতে পারত। যেহেতু ইন্দো-ইউরোপীয়রা ব্যাপকভাবে অশ্বের ব্যবহার করত, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দে তারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

অশ্ব ও রথের মালিকানা এমন এক অশ্ব-ভিত্তিক অভিজাততন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল, যারা সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এইভাবে, পূর্বেকার সাম্যবাদী সমাজে অশ্বের প্রবর্তন সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ডেভিড অ্যানটনি অশ্ব ব্যবহারের এই অর্থবহ দিকগুলি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এই কাজটি তিনি করেছেন খ্রীস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় অশ্ব-ব্যবহারের আদর্শকে সামনে রেখে।[১০২] যদিও তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কোনও কোনও পণ্ডিত সমালোচনা করেছেন, অ্যানটনির কাজের নির্গলিতার্থ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও ইরাণে অস্থিসাক্ষ্য ও চিত্রাদির দ্বারা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ থেকে অশ্বের ব্যাপক ব্যবহার সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানে সোয়াত উপত্যকায় ও বেলুচিস্তানে অশ্বের নমুনা ও পোড়ামাটির অশ্বমূর্তি পাওয়া গেছে। ভারতে হরিয়ানা অঞ্চলে হরপ্পীয় ও চিত্রিত ধূসর পাত্র-স্তর যেখানে প্রাবৃত এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে হরপ্পীয় সংস্কৃতির শেষ দিকের স্তরে অশ্ব-সংক্রান্ত নমুনাদি পাওয়া যায়। তবে সমৃদ্ধতম প্রাপ্তিস্থান পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। কিন্তু গন্ধার-সমাধিগুলিতে অশ্বের সাজ-সজ্জা পাওয়া গেলেও চক্র, অর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় নি। যদি আরও প্রত্নস্থলে খননকার্য হয়, তাহলে উপমহাদেশে অশ্ব-ব্যবহারের সাংস্কৃতিক অর্থ-নির্ণয় আমরা আরও ভাল ভাবে করতে পারি এবং ঋগ্বেদের যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারি। যেহেতু নিকটবর্তী মধ্য এশিয়া অঞ্চলে অশ্বের উল্লেখযোগ্য নমুনাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অশ্বের অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

৩. ভাষা ও লৈখিক প্রমাণ

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষের দিকে দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া অথবা ইরাকে এবং খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ইরাণে প্রায় অব্যাহত ভাবে লেখমালায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পূর্বশাখার আবির্ভাব লক্ষিত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয়দের নিজস্ব কোনও লিপি ছিল না, এবং তাই তাদের ভাষাকে পাওয়া যায় মেসোপোটেমিয়ায় প্রচলিত কীলকাকার লিপিতে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পশ্চিম শাখার শব্দগুলি পাওয়া যায় আনাতোলিয়াতে প্রাপ্ত খ্রীস্টপূর্ব ঊনবিংশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর হিট্টাইট লেখমালায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিট্টাইটরা এই ভাষায় কথা বলত। অদ্যাপি বিদ্যমান হিট্টাইট রচনাগুলি লিখিত হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই, যদিও তার মধ্যে কতকগুলি খ্রীস্টপূর্ব সপ্তদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর মূল রচনার অনুলিপি।[১] ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, আনাতোলিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি আঞ্চলিক রূপ প্রচলিত ছিল। এরমধ্যে লুসিয়ান নামে ভাষাটি সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০ থেকে প্রচলিত ছিল।[২] হিট্টাইট ভাষায় **ইনর** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা স্পষ্টই ইন্দ্রকে বোঝায়।[৩] ১১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যখন হিট্টাইট শাসনের অবসান হয়, তিনটির মধ্যে একটি আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করতেন যারা, তাঁরা চিত্রলিপি গ্রহণ করেন, তবে তাঁদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ই ছিল।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পশ্চিম শাখার শব্দগুলি আনুমানিক ১৬০০ খ্রীস্টপূর্বে গ্রীসের মাইসিনিতেও পাওয়া যায়। মাইসিনি আনাতোলিয়া থেকে বেশি দূরে ছিল না। কিন্তু মাইসিনি থেকে প্রাপ্ত লেখগুলিতে এমন অনেক ব্যক্তি ও স্থানের নাম পাওয়া যায়, যা ইন্দো-ইউরোপীয় নয়।

বিশেষ অর্থপূর্ণ হল এই যে, ইন্দো-আর্য অথবা আদি-ভারতীয়দের ভাষার প্রথম নমুনা পাওয়া যায় অ্যাগেড বংশের সময়কার একটি ফলকে। আমরা দুটি নাম পাই, যার পুনর্নির্মিত রূপ হল **অরিসেন** এবং **সোমসেন**। হারমাট্টার মতানুযায়ী এগুলির সময়কাল ২৩০০-২১০০ খ্রীস্টপূর্ব।[৪]

আবার, আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৬০০-তে ব্যাবিলনিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইরাকে প্রাপ্ত ক্যাসাইট লেখগুলিতে ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাসাইট শাসন সুরু হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রাচীনতম লেখমালার সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী। ঐ লেখমালা থেকে মনে হয়, ক্যাসাইটরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। তাদের লেখমালায় উল্লেখিত 'সূর্য্যস্' ও 'মরুতস্' ঋগ্বেদের 'সূর্য্য' ও 'মরুত'কে মনে করিয়ে দেয়। ক্যাসাইট ভাষায় বায়ু-দেবতাকে বলা হয় **বুরিয়স**। এই শব্দটি বৈদিক দেবতা বায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। এখনও বায়ু অর্থে 'বয়ার' কথাটি হিন্দীতে প্রচলিত। হোমারের রচনাবলীতে (খ্রীস্টপূর্ব নবম শতাব্দী) দুই বায়ুর

একটিকে বলা হয়েছে 'উত্তরের বোরিয়াস'।[৫] কয়েকজন ক্যাসাইট রাজার নামের শেষে বুরিয়াস কথাটি দেখা যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'ইন্দস্' শব্দটিও ব্যবহার করেন, যার সঙ্গে ইন্দ্রের সাদৃশ্য বর্তমান। এইসব আদি-ইন্দো আর্য (যাকে আদি-ভারতীয়ও বলা হয়) শব্দগুলি ক্যাসাইট ভাষায় পাওয়া যায় খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে।[৬] ব্যাবিলনিয়াতে ক্যাসাইট-অনুপ্রবেশ সুরু হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কীলকাকার লিপিতে প্রাপ্ত একটি চিত্র-প্রতীক থেকে যদিও মনে হয় মেসোপোটেমিয়াতে অশ্ব অজ্ঞাত ছিল না, ক্যাসাইট শাসন প্রতিষ্ঠার পরেই অশ্বের ব্যবহার সাধারণভাবে সুরু হয়। ক্যাসাইটরা অশ্ব নিয়ে এসেছিল জাগ্রোস পর্বত থেকে আর ব্যাবিলনীয়রা তাকে 'পার্বত্য গর্দভ' বলে উল্লেখ করত। কাজেই যদিও অশ্ব আগেই তাদের কাছে পরিচিত ছিল, ক্যাসাইট শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে তার প্রচলন ব্যাপকভাবে সুরু হয়।[৭]

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তর সিরিয়া বা মিতানিদের দেশে ইন্দো-ইউরোপীয়দের ভাষাগত উপস্থিতির স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় অথবা অবিকল সাদৃশ্যযুক্ত কতকগুলি শব্দের উল্লেখ মিতান্নিদের লেখতে আছে।[৮] **ঋগ্বেদেও** এই সব দেবতাদের দেখা যায়। এই কারণে উক্ত লেখটির ভাষাকে বলা হয় ইন্দো-আর্য। বারো একে আদি ইন্দো-আর্য বলা পছন্দ করেন।[৯] মিতান্নিয়রা তাদের রাজ্যস্থাপন করেছিল খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে এবং তাদের রাজাদের নামে ইন্দো-আর্য শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অশ্ব-প্রশিক্ষণ ও রথ-চালনা সম্পর্কিত খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি হিট্টাইট রচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এই রচনাটির লেখক ছিলেন একজন মিতান্নি অশ্ব-প্রশিক্ষণদাতা। রচনাটিতে অশ্বের গতি, আস্তাবলে তাকে নিয়ে আসার সময়, তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, এসব সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং অশ্ব-সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্য এতে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে এমন অনেক শব্দ আছে যার সঙ্গে সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। রথ একটি পথে চলতে যে-স্তর বা ধাপগুলি অতিক্রম করে, তা প্রকাশ করতে যে-সংখ্যাগুলি এতে ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে সংস্কৃতের মিল আছে। সেগুলি হল **ঐক** (এক), **তের** (ত্রি), **পঞ্জ**(পঞ্চ), সত্ত (সপ্ত) এবং **ন** (নব)। হুরিভাষার একটি রচনায় অশ্বের গাত্রবর্ণের বর্ণনা আছে এইভাবে : **বব্রু** (বভ্রু), **পরিত** (গলিত) ও **পিঙ্কর** (পিঙ্গল)।[১০] এই শব্দগুলির অর্থ হল যথাক্রমে পাংশু, ধূসর ও লোহিত। উল্লেখযোগ্য যে, **বভ্রু** ও **পলিতের** সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত শব্দ অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যাবে যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে গ্রীস থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীদের অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

ফ্রিজিয়রাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত এবং তাদের লেখগুলি পাওয়া গেছে আনাতোলিয়ায় খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে।[১১] তাদের প্রথম

উল্লেখ পাওয়া যায় অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের শত্রুরূপে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি অ্যাসিরিয় লেখতে বলা হয়েছে যে, 'মুস্‌কি' নামে একটি জাতি ২০,০০০ লোক নিয়ে অ্যাসিরিয়া আক্রমণ করেছিল। মুস্কিদের ফ্রিজিয়দের থেকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে[১২]। মুস্কি শব্দটির উৎপত্তি ঋগ্‌বেদের মুষক থেকে, যার অর্থ হল ইঁদুর। এর সমগোত্রীয় শব্দ আছে গ্রীক, ল্যাটিন, লিথুয়ানীয় ও স্লাভ ভাষায়।[১৩] খুব সম্ভবতঃ মুষক বা ইঁদুর ছিল মুস্কি জাতির টোটেম বা কল্পিত পূর্বপুরুষ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পূর্বশাখার উপস্থাপনা দেখা যায় ইরাণের লেখমালায় খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কোনও ভারতীয় অভিলেখে ইন্দো-আর্য ভাষার দেখা পাওয়া যায় না।

লেখমালা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীদের যাত্রা-পথে কতকাংশে আলোকপাত করতে পারে। এটি সম্ভব যে, ইন্দো-ইউরোপীয়রা কৃষ্ণসাগর অঞ্চল থেকে আনাতোলিয়াতে এসেছিল। কিন্তু প্রাচীন ইরাক ও সিরিয়াতে যে আদি ইন্দো-আর্যভাষীদের দেখা যায়, তাঁদের যাত্রা-পথের কোনও স্পষ্ট নিশানা পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবতঃ পশ্চিমে ভল্‌গা থেকে পূর্বে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আন্দ্রোনোভো সংস্কৃতি-স্তরে আদি-আর্য ভাষা বিকশিত হয়েছিল। ঐ অঞ্চলে 'আদি-ইন্দো ইরাণীয়' ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে বাকি ইন্দো-আর্যদের সম্ভাব্য ব্যবধান সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে।[১৪] এটি হয়ত ঘটেছিল আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অথবা আরও কিছু পরে। বারোর মতে আদি-ইন্দো আর্যরা প্রথম এসেছিলেন ইরাণে, যেখান থেকে তাদের স্থানচ্যুত করেছিল আদি-ইন্দো-ইরাণীয়রা। স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে আদি-ইন্দো-আর্যরা পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ইরাণীয়রা তাদের ভাষায় 'হ'-এর ব্যবহার করত আর, ইন্দো-আর্যরা 'স'-এর ব্যবহার করত। 'হ'-ভাষীরা বা ইরাণীয়রা 'স'-ভাষীদের অর্থাৎ ইন্দো-আর্যদের ক্রমশঃ নির্বাসিত করেছিল এবং অবশেষে ইন্দো আর্য-ভাষীরা ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।[১৫]

৪. আর্যদের আচার-অনুষ্ঠান

পশুবলি

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পূর্বশাখাভুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে শবদাহের পর সমাধি দেওয়া, অগ্নিপূজা, সোম-বিশ্বাস এবং পশুবলি, যার অন্তর্গত ছিল অশ্ববলি, প্রভৃতির প্রমাণ মেলে। বৈদিক ও আবেস্তীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান ছিল তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে। আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি ইরাণ ও ভারতে বসতিকারীদেরই প্রতীক ছিল কিনা অথবা অন্যত্রও এই সব অনুষ্ঠান দেখা যায়। 198011

পশুবলি শুধু ভারত ও ইরাণে নয়, গ্রীস ও রোমেও প্রচলিত ছিল, এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান। প্রথাটি অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির[১] মধ্যেও দেখা যায়, যার জন্য ভাষাগত প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।[২] বৈদিক রচনাবলী ও **আবেস্তায়**[৩] গবাদি পশুবলি সাধারণভাবে দেখা যায়। এই বলির উল্লেখ হোমারের রচনাতে আছে, অবশ্য সেখানে মেষবলি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।[৪] পশুপালনের প্রথমস্তরে সম্ভবতঃ পশুবলি বেশি প্রচলিত ছিল। যতদিন পর্যন্ত পশুপালকেরা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে না এবং কৃষি ও পরিবহনে পশুদের নিয়োগ করে না, ততদিন তারা তাদের গৃহপালিত পশুদের মাংস খেয়ে যেতে থাকে। কতকগুলি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণে দুধ খায় না। মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের গোন্দ্‌রা যেমন বিশ্বাস করে যে, দুধ কেবলমাত্র বাছুরের জন্য, আর কারও জন্য নয়। কোনও কোনও উপজাতি গবাদিপশুর দুধ না পান করে রক্ত পান করে। এইভাবে প্রাচীনতম কালে পশুপালকেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে মাংস উৎসর্গ করত, এবং পরিবর্তে পশুসম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করত, যাতে তাদের গবাদি পশুবলিদান ও পশুমাংস আহার অব্যাহত থাকতে পারে।[৫]

লিঙ্কনের মতে ইন্দো-ইউরোপীয় পশুপালকদের ধর্মানুষ্ঠানাদি পূর্ব-আফ্রিকার পশুপালক সমাজে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে তুলনীয় বৈদিক যুগের গবাদি পশু-বলি, যাকে বলা হয়েছে **পশুবন্ধ**, এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য-যুক্ত ছিল, যার সন্ধান পাওয়া যায় পূর্ব ইউরোপের তৃণভূমি অঞ্চলে। দক্ষিণ রাশিয়া ও উক্রেনে স্রেদ্‌নি স্টগ্‌ সংস্কৃতিতে (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০-৩৫০০) পশুবলি প্রথা দেখা যায়। দেরেবিক নামক স্থানে প্রাপ্ত পূর্ণবয়স্ক ঘোড়ার মাথা ও তার সঙ্গে কোনও ঘোড়ার বাঁ পায়ের অস্থি, দুটি কুকুরের দেহাবশেষ এবং বন্য শূকরের আকৃতি-বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রমূর্তি ইত্যাদি ধর্মীয় আচারের ইঙ্গিত বহন করে।[৬] নিম্ন নীপার নদী-উপত্যকায় অন্য একটি স্থানে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০-৩৫০০ অব্দের গবাদি পশু ও অশ্বের নমুনা আমরা লক্ষ্য করি। একটি **কুরগান** বা বৃত্তাকার অঞ্চলে সমাধিক্ষেত্রের নীচে পাওয়া গেছে পশুর হাড়গোড়, পাত্রাদির ভগ্নাবশেষ এবং

গিরিমাটির নমুনা।[৭] কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে বিস্তৃত এক বিশাল এলাকায় এই **কুরগন** জাতীয় সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাধিগুলি থেকে এই সত্য জানা যায় যে, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদির অস্থি মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্যরূপে উৎসর্গ করা হত। প্রায়শঃ ভেড়ার মাথার খুলি ও সামনের পা দুটি উৎসর্গ করা হত।[৮]

প্রাচীন ইরাণে পশুবলি প্রথা ছিল সর্বজনীন। **আবেস্তায়** ১০০ ঘোড়া, ১০০০ বৃষ ও ১০,০০০ মেষ বা ছাগ বলির উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়।[৯] আবার এতে উল্লেখ করা হয়েছে ১০০০ ঘোড়া, ১০০০ উট, ১০০০ ষাঁড় এবং ১০০০ ক্ষুদ্রাকৃতি সব প্রজাতির তরুণ বয়স্ক গবাদি পশু বলির প্রতিশ্রুতি।[১০] উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক সাহিত্যে গরু, ঘোড়া, ভেড়া ও এমন কি শূকর বলির বিধান আছে। **শতপথ ব্রাহ্মণে** এই সবের উদাহরণ আছে। একই গ্রন্থে বলিদানের অযোগ্য কয়েক শ্রেণীর মানুষ ও পশুর তালিকাও আছে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নির্বীর্য ব্যক্তি, **গৌর** (এক প্রকার মহিষ), **অরণ্য** (বন্য পশু), **উষ্ট্র** (উট) ও **শরভ** (হাতী)।[১১] এটি প্রতীয়মান যে, যে-সব মানুষ ইউরেশিয়াতে বাস করতেন, তাঁরা মহিষ ও হাতীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সেই কারণে, এই সব পশুর দেহাবশেষ দক্ষিণ রাশিয়া ও উক্রেনের সমাধি ক্ষেত্রগুলিতে পাওয়া যায় নি। ভারতীয় উপমহাদেশে পরবর্তীকালে মহিষ-বলির সূত্রপাত হয়, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এ সম্পর্কে কোনও বিধান নেই। মনে হয়, বৈদিক যুগে প্রচলিত পশুবলির সঙ্গে তুলনীয় প্রথা দক্ষিণ রাশিয়া ও উক্রেনে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ থেকে প্রচলিত ছিল। লোথালে খননকার্যের তত্ত্বাবধায়ক এস. আর. রাও বলেছেন যে, লোথালে পশুবলি প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই মতের সপক্ষে বাস্তবে কোনও প্রমাণ নেই। লোথালে যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা হল গবাদি জাতীয় পশুর দেহের কিছু দগ্ধ অংশ।[১২] এই উপাদান প্রমাণ করে মাংসাহার প্রথা, পশুবলির প্রথা নয়।

অশ্বমেধ

ইন্দো-ইউরোপীয়রা অশ্বের ব্যবহার করত বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁরা কেউই অশ্ব বলিদান, ভারতে যাকে বলা হত **অশ্বমেধ**, প্রথা অনুসরণ করত না। বৈদিকযুগে রাজা বা উপজাতির নেতা তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য **অশ্বমেধের** অনুষ্ঠান করতেন। একটি অশ্ব মুক্ত করে দেওয়ার পর সে এবং তার সঙ্গে রাজার সৈন্যরা যে ভূভাগের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় পরিভ্রমণ করত, সেই ভূ-ভাগ যজ্ঞকারী রাজার অধীনস্থ বলে বিবেচিত হত। প্রত্যাবর্তনের পর অশ্বটি বলিদান করা হত এবং তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হত। রাজার সর্বাধিক প্রিয়তমা মহিষীকে মৃত অশ্বের সঙ্গে শয়ন করতে হত এবং গোপনে তার সঙ্গে 'সহবাসও' করতে হত।[১৩] হোমার কোনও অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেন নি, যদিও মৃতের উদ্দেশ্যে অশ্ববলিদানের ইঙ্গিত তিনি

দিয়েছেন।[১৪] রোমের ইন্দো-ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অক্টোবর মাসে অশ্ববলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই অনুষ্ঠানকে বলা হত **অক্টোবর ইকিউয়াস**। ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতার পর দলের মধ্যে দক্ষিণদিকের ঘোড়াটিকে বর্শাফলকে বিদ্ধ করে নিহত করা হত এবং তারপর দেহটি খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হত।[১৫] মধ্যযুগের আয়ার্ল্যাণ্ডে উপজাতীয় রাজার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষ্যে একটি ঘোটকী বলিদান করে তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করা হত বলে শোনা যায়।[১৬]

লুই রেনু মনে করেন যে, **অশ্বমেধ** ছিল একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্মানুষ্ঠান।[১৭] প্রাক্-বৈদিক ভারতে অশ্বমেধ বা অশ্ব-বলিদানের কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না নিঃসন্দেহে। খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০-৩৫০০ অব্দে অশ্ববলির সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত মেলে দক্ষিণ রাশিয়া ও দক্ষিণ উক্রেনে। কিন্তু গরু, ভেড়া, ছাগল ও কুকুরের সঙ্গে ঘোড়াকে উৎসর্গ করা হত মৃতের উদ্দেশ্যে।[১৮] যাই হোক, কতকগুলি সমাধিক্ষেত্রে অশ্ব-উৎসর্গ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। জিরসিমেভেকি-১ সমাধিতে স্বতন্ত্রভাবে অথবা গরু বা ভেড়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবেদিত ঘোড়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে।[১৯] ভল্গার বনাঞ্চলে তৃণভূমির মধ্যভাগে সেজ্মিতে আবিষ্কৃত একটি পবিত্র স্থানে দুটি ঘোড়ার দেহাবশেষ আছে।[২০] খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর সিনতস্থের সমাধিক্ষেত্রে একটি মাত্র সমাধিতে সাতটি ঘোড়া বলিদান করা হয়েছিল।[২১] যাই হোক, মৃতের সঙ্গে অশ্ব সমাধিস্থ করা হত, যাতে পরলোকে খাদ্য অথবা পরিবহনের ব্যবস্থা থাকে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকে মানুষের জীবিতকালে অশ্ব-নিধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এর কারণ হতে পারে মনুষ্য বসতিগুলিতে যথেষ্ট খননকার্যের অভাব। তথাপি এই যুক্তি দেখানো হয় যে, কোনও ব্যক্তি যে অশ্ববলির অনুষ্ঠান করতেন তা, সেই ব্যক্তির মরণোত্তর অনুষ্ঠানরূপে তার গোষ্ঠীর দ্বারা প্রদর্শিত হতে পারত। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অশ্ব-বলিদান করা হয় স্বতন্ত্রভাবে অথবা অন্যান্য পশুদের সঙ্গে। এই প্রথা সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে **অশ্বমেধযজ্ঞে** রূপান্তরিত হয়, যার বিস্তৃত বিবরণ আছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। এই একই প্রথা রোমে **অক্টোবর ইকিউয়াস** নামের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

অগ্নিবেদী

আবেস্তায় অগ্নি-পূজা সবচেয়ে সার্থক ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। কিন্তু যদিও **ঋগ্বেদে** অগ্নি গুরুত্বপূর্ণ দেবতা, বৈদিক যুগে প্রজ্বলিত অগ্নি স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হত না। বৈদিক যুগে অগ্নিকে মধ্যস্থকারী বলে বিবেচনা করা হত, যার কাজ ছিল তাকে প্রদত্ত আহুতি দেবতাদের নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া। যদিও **ঋগ্বেদে** অগ্নিবেদীর স্পষ্ট উল্লেখ নেই, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা আছে। অগ্নিবেদীতে অগ্নির পূজা করা হত। আবার, সেই অগ্নিবেদী উনান বা **চুলহার** কাজ করত, তাতে দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করা হত।

একথা বলা যায় না যে, অগ্নিবেদী হরপ্পার অধিবাসীদের সংস্কৃতির প্রতীক ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রধান প্রত্নস্থলগুলিতে অগ্নিবেদী পাওয়া যায় নি। অবশ্য, বেলুচিস্তানে আমরিতে প্রাপ্ত একটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] এর আসল স্বরূপ প্রশ্নাতীত নয়, এবং এর তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নি। লোথালের কয়েকটি বৃত্তাকার ও আয়তাকৃতি গঠনকে রাও অগ্নিবেদী বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩] কিন্তু রাও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকাশ করেছেন যে, এগুলি উনান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারত। তাই তিনি দেখিয়েছেন যে, এগুলি আকারে বৃহৎ, অথচ জ্বালানি প্রবেশ করানোর কোনও পথ নেই।[২৪] যাই হোক, দুইটি ৭০ বর্গফুট পরিমিত গঠন ব্যতীত আর সবই অত্যন্ত ছোট ছোট। সাধারণতঃ গোলাকৃতি যে-গুলি, তার পরিধি ১ ফুট ও ইঞ্চি, আর যে-গুলি আয়তাকৃতি তার পরিমাপ ১$\frac{১}{২}$ বর্গ ফুট।[২৫] রাও-প্রদত্ত অনু-চিত্রাবলীতে তিনটি 'অগ্নিবেদী' দেওয়ালের পাশে অবস্থিত দেখা যায়।[২৬] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেওয়ালের পাশে বেদী তৈরীর কোনও বিধান নেই, অথবা এমন কোনও প্রথা প্রচলিতও নয়। আবার, বিধান দেওয়া হয়েছে যে, **আহবনীয়** বা যজ্ঞের অগ্নি **গার্হপত্য** বা গৃহস্থের রক্ষিত অগ্নি থেকে আট **প্রক্রম**[২৭] বা ১৫ ফুট দূরত্বে থাকবে।[২৮] লোথালে প্রাপ্ত তথাকথিত বেদীগুলির অধিকাংশ এই বিধান অনুযায়ী গঠিত নয় এবং সেকারণে এগুলিকে অগ্নিবেদী বলে বিবেচনা করা যায় না। সম্ভবতঃ এগুলি ছিল যৌথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত উনান, যাতে জ্বালানি উপর দিক থেকে দেওয়া হত। বৃহদাকৃতি-বিশিষ্ট যে গঠনটি, তার ব্যবহার-পদ্ধতি স্পষ্ট নয় ; তবে এটি অগ্নি-আধার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। খননকর্তা অগ্নিবেদীর প্রাচীনতম সাক্ষ্য দিয়েছেন 'লোথাল' ২ক' থেকে[২৯], যার রেডিও কার্বন তারিখ হল ১৫৫৫+/-খ্রীঃ পূঃ ১৩৫।[৩০] যেহেতু অধিকাংশ বেদীর সময়কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০, যদি ঐগুলিকে অগ্নিবেদী বলে মনেও করা হয়, সেক্ষেত্রে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

কালিবঙ্গানে প্রাপ্ত সাতটি গঠনকে 'অগ্নিবেদী' বলা হয়, যেহেতু এর চেয়ে উপযোগী কোনও শব্দ পাওয়া যায় না।[৩১] এই 'বেদী'গুলির আকৃতি সঠিকভাবে বলা হয় নি। অর্থপূর্ণ এই যে, এগুলি সবই পোড়ামাটির ইঁটের তৈরি দেওয়ালের পাশে অবস্থিত।[৩২] কিন্তু যজ্ঞাদির বিধান আছে যে সব গ্রন্থে তাতে অগ্নিবেদীর (যেমন, **অগ্ন্যাধান**) এই রকম অবস্থানের নিয়ম নেই। অতএব এইগুলিকে অগ্নিবেদী বলা যায় না। এমনকি খননকর্তা বি. বি. লালও এই মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নি। তাছাড়া মনে হয় এগুলির আবির্ভাব হয়েছিল, যখন কালিবঙ্গানে হরপ্পা বসতির অবসান প্রায় আসন্ন,[৩৩] আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৬৫০এ,[৩৪] এবং তথাকথিত অগ্নিবেদীগুলির উপস্থিতি সম্ভবতঃ বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ফল।[৩৫] এদের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, লোথাল ও কালিবঙ্গানে প্রাপ্ত অগ্নিবেদীগুলি সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়।[৩৬]

বৈদিক সংস্কৃতির কিছু উপাদান ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে দেখা যায়, কিন্তু বৈদিক অগ্নিবেদী এই অঞ্চলের বাইরে পরিচিত নয়। উক্রেনের **কুরগান** সমাধিগুলিতে (খ্রীঃ পূঃ ৪০০০-৩৫০০) অগ্নিশালা পাওয়া যায়। শুধু **কুরগান** নয়, সমাধিগুলির সমীপস্থ এলাকায় ঐগুলি দেখা যায়।[৩৭] দক্ষিণ তাজিকিস্তানে তুলখার 'টেপে' প্রাপ্ত দুটি অগ্নিশালার তারিখ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ। স্ত্রীলোকের সমাধিতে প্রাপ্ত গোলাকার চুল্লিকে বলা হয়েছে **গার্হপত্য** আর পুরুষদের সঙ্গে প্রাপ্ত আয়তাকৃতি অগ্নিশালাকে বলা হয়েছে **আহবনীয়**।[৩৮] **শতপথ ব্রাহ্মণে** বলা হয়েছে যে, অগ্নিবেদীর নির্মাতাদের **শ্মশান** (সমাধিস্তূপ) হবে আয়তাকৃতি,[৩৯] কিন্তু কোনও অগ্নিবেদী সমাধিস্তূপে অবস্থিত হবে না। মনে হয়, বৈদিক যুগের অগ্নিবেদীগুলি যজ্ঞকারীর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে থাকত। সমাধিগুলিতে যে অগ্নিশালাগুলি দেখা যায়, সেগুলির নিশ্চয়ই ধর্মীয় আচারগত গুরুত্ব ছিল, কিন্তু ওইগুলিকে বৈদিক যজ্ঞবেদীর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ঐগুলি হয়ত শীতকালে অগ্নি-স্থানের কাজ করত অথবা সমাধিতে রান্না-বান্নার জন্য ব্যবহৃত হতে পারত। একথা সুবিদিত যে, মিশরের পিরামিডগুলিতে সমস্ত রকম জাগতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকত। আহার, নিদ্রা ও শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানাদি ছাড়াও প্রসাধন-সামগ্রীরও ব্যবস্থা থাকত। অবশ্য, পিরামিডগুলিতে অগ্নিবেদী বা অগ্নিশালা স্থাপিত হয় নি। এই রকম ব্যবস্থা মনে হয় ইউরেশিয়ার অশ্ব-ব্যবহারকারী অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

যদিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, তুর্কমেনিয়াতে সমাধি ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র অগ্নিশালার অস্তিত্ব দেখা যায়। 'তোগোলোক—২১' প্রত্নস্থলে একটি মন্দিরে অগ্নি-উপাসনার স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় এবং এখানকার অগ্নিবেদীগুলির তারিখ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮০০।[৪০] একটি অগ্নি-মন্দির চত্বরে খননের ফলে দুইটি বেদী আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্ষুদ্রাকৃতি বেদী অগ্নি-দেবতাকে উৎসর্গ করা হত এবং বৃহদাকৃতি বেদীর উদ্দেশ্য ছিল (অগ্নির) আহুতি গ্রহণ করা। নগরদুর্গের মধ্যবর্তী এলাকার বাইরে উভয় দিকে দুটি বেদী অবস্থিত।[৪১] উজবেকিস্তানে ফারঘানে লৌহযুগের (খ্রীঃ পূঃ ১২০০) অগ্নিস্থান পাওয়া গেছে। প্রাচীন সোগডিয়ানাতে গহ্বরযুক্ত বর্গাকৃতি ও গোলাকৃতি অগ্নিস্থানও পাওয়া গেছে।[৪২]

ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বা তারও পূর্বেকার অগ্নিস্থানের সংবাদ পাওয়া গেছে। খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ থেকে ১১০০ পর্যন্ত বেলুচিস্তানের কচি সমতল ভূমিতে যে-গুলি পাওয়া গেছে তাদের আকৃতি বর্গক্ষেত্রের মত। রান্নার পাত্রাদি তার উপর ঝিঁকার সাহায্যে চাপান হত। কারখানাতে লৌহযুগের প্রথম দিককার অগ্নিস্থানগুলিতে একই ধরনের ঝিঁকার সন্ধান পাওয়া গেছে।[৪৩] পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বা তার কিছু আগের অগ্নিস্থানের সংবাদ পাওয়া গেছে এবং এই সময়ে তুর্কমেনিয়া ও মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ অংশে ঐগুলি দেখা যায়।

অত্রঞ্জিখেরায় চিত্রিত ধূসর পাত্রাদির স্তরের ঠিক পূর্ববর্তী কৃষ্ণলোহিত পাত্রাদি স্তরে তিনটি গৃহস্থালীর উনুন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটিকে যজ্ঞস্থলী বলে মনে করা হয় এবং খননকর্তা এর তারিখ নির্দেশ করেছেন খ্রীঃ পূঃ ১৪৫০ থেকে ১২০০ এর মধ্যে[৪৪] কিন্তু এটিকে মনে হয় খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অথবা তার পরবর্তী কালের। কেননা প্রাক-চিত্রিত ধূসর পাত্র-যুগেরর অত্রঞ্জিখেরায় কৃষ্ণলোহিত পাত্রের স্তরের রেডিও কার্বন তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৮৭৫ এর পূর্বের নয়।[৪৫]

আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, জলন্ধর জেলায় নগরে এবং লুধিয়ানা জেলায় দধেরিতে পরবর্তী হরপ্পীয় ও চিত্রিত ধূসর পাত্রাদি-সংস্কৃতি যেখানে প্রাবৃত, সেই স্তরে অগ্নিবেদীর অস্তিত্বের ইঙ্গিতবাহী গহ্বরাদি পাওয়া গেছে।[৪৬] নগরে পোড়ামাটির ইঁটের তৈরি দুটি গোলাকৃতি নির্মাণ পাওয়া গেছে। এগুলিকে মনে করা হয় 'সম্ভবত' ধর্মীয়।[৪৭] দধেরিতেও তিনটি গোলাকৃতি নির্মাণ পাওয়া গেছে, একই ভাবে যাকে মনে করা হয় 'সম্ভবত' ধর্মীয়।[৪৮] অনেক পরবর্তী কালে এই ধরনের নির্মিতি পাওয়া গেছে মথুরায়। এগুলির তারিখ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ এবং কৌশাম্বীতে এগুলির তারিখ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০। কিন্তু বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং উপমহাদেশের বাইরে যে-সব গর্ত বা খাদ পাওয়া গেছে, সে-গুলিকে অগ্নি-পূজা ও অগ্নিবেদীর সম্প্রচারক একটি নতুন জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করা যেতে পারে।

সোমে বিশ্বাস

আবেস্তীয় ভাষায় যাকে বলা হয়েছে **হাওম,** সেই **সোম**-সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ছিল বৈদিক ও ইরাণীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ক্রিয়া-কর্মে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, কেননা, বিশ্বাস করা হয় যে, **সোম** গান করেই ইন্দ্র অলৌকিক কার্যাদি করেছিলেন।

সোম বৃক্ষকে সনাক্ত করার বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে বিতর্কিত। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারাদি থেকে দেখা যায়, **সোম**-সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রাচীনতম সাক্ষ্য রয়েছে তুর্কমেনিয়াতে। মার্গিয়ানায় 'তোগোলোক—২১'-এর মন্দির-চত্বরে সম্ভবতঃ পানীয় **সোম** রস প্রস্তুত করা হত। মার্গিয়ানা হল দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কমেনিয়াতে মুরঘব নদীর ব-দ্বীপ। এখানে, একটি ইঁটের তৈরি বিশেষ মঞ্চে এক সারি পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পাত্রগুলিতে পানীয় **সোম** ঢেলে দেওয়া হত এবং পুরোহিতেরা সেগুলি নিয়ে যেতেন সেই যজ্ঞবেদীর নিকটে যেখানে আহুতি দান করা হত।[৪৯] পাত্রগুলিতে 'এফিড্রা' গাছের ছোট ছোট ডাল দেখা যায়। হ্যারিফক্ এই ডালগুলিকে **সোম** বলে সনাক্ত করেছেন।[৫০] এই আবিষ্কারগুলি হয়েছে প্রাক্-আন্দ্রোনোভো ও পরবর্তী 'নমজগা-৫'

সংস্কৃতির প্রাবৃত স্তরে।[৫১] অতএব, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, **হাওম** বা **সোম**-সম্পর্কিত বিশ্বাস আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ নাগাদ সূত্রপাত হয়।

সোম জেন্দ্‌ আবেস্তায় হাওম রূপে আবির্ভূত নিঃসন্দেহে, কিন্তু এতৎ সম্পর্কিত ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা **সোম**-পান ইন্দো-ইউরোপীয়দের পশ্চিম শাখায় দেখা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাক্‌-জরথুস্ত্র যুগের মানুষদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল। পরে তাদের কাছ থেকে আবেস্তীয় যুগের জাতিগুলি এটি গ্রহণ করে। যদি **সোমকে** 'এফিড্রা' বলে সনাক্ত করা সঠিক হয়, তবে **সোম**-রস পানের ধারণা ইরাণ হয়ে ভারতে এসেছিল।

মৃতের সৎকার

পশুপালক সমাজে শব-দাহ অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে দৃষ্ট হয়। এই সমাজের লোকে মৃতদেহ মাটিতে সমাধিস্থ করত না এই কারণে যে, তাদের অর্থনীতির প্রকৃতি এমন ছিল, যাতে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করত।[৫২] এমনও মনে করা হয়, ধাতুবিদ্যার অগ্রগতির দ্বারা জানা গিয়েছিল যে, আগুনের দ্বারা ধাতুকে বিভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়। তাই আগুনকে মানবদেহের সংস্পর্শে আনা হল এই আশায় যে, মৃত ব্যক্তি নবজীবন লাভ করতে পারে।[৫৩] উৎপত্তির কারণ যাইহোক না কেন, বৈদিক যুগে মানুষ শব-দাহের পাশাপাশি সমাধি-দানের প্রথা অনুসরণ করত। যাইহোক, বৈদিক ভারতীয়দের বিশেষত্ব ছিল এই প্রথা এবং সম্ভবতঃ আদি-ইরাণীয়রাও এই একই প্রথা অনুসরণ করত। হরপ্পীয় ও প্রাক্‌-বৈদিক যুগের মানুষেরা সাধারণতঃ মৃতের সমাধি দিত। হরপ্পায় 'সমাধিক্ষেত্র-এইচ' (খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৪০০) থেকে জানা যায় যে, শবের একটি অংশ সমাধিস্থ করা হত, যে-প্রথা নবাগতদের উপর আরোপ করা হয়। আমেরিকার প্রত্নতাত্ত্বিকদের (১৯৮৬-৯৩) সাম্প্রতিককালে হরপ্পায় আনুভূমিক খনন-কার্যের দ্বারা এ পর্যন্ত শবদাহের ইঙ্গিত মেলে নি।[৫৪]

ঋগ্বেদে দেখা যায়, সমাধি ও দাহ, উভয় প্রথাই ছিল। শব-দাহ, দগ্ধ-অস্থিগুলি সংগ্রহ করে একটি পাত্রে রেখে সমাধিস্থ করা এবং অশৌচের সঙ্গে সম্পর্কিত আচার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ইন্দো-ইউরোপীয় কিনা তা নির্ণয় করা রেনু দুঃসাধ্য মনে করেন।[৫৫]

যদিও **আবেস্তায়** শব-দাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, গাইগার অনুমান করেন যে, **দখমা** (যে-স্থানে পার্সিরা মৃতদেহ ফেলে দিত) গোড়ায় ছিল শব-দাহের স্থান।[৫৬] মিল্‌স্‌ এই মত পোষণ করেন যে, সমাধি ও দাহ উভয়ই গথিক যুগে অনুমোদিত ছিল এবং আরও মনে করেন, অন্ততঃ মূল মাজদা-উপাসনা শব-দাহ থেকে নিবৃত্ত হয় নি।[৫৭]

ইউরোপে প্রাচীনতম মৃতসংকারের সমাধিগুলি রয়েছে হাঙ্গেরীতে বুদাপেস্টের উত্তরে এবং এগুলির সময়কাল খ্রীঃ পূঃ উনপঞ্চাশ ও সাতচল্লিশতম শতাব্দী।[৫৮] খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সহস্রাব্দে এগুলি ব্যাভেরিয়া ও হল্যাণ্ডে দেখা যায়।[৫৯] এশিয়ায় কাজাকাস্তানের

উত্তর অংশে, মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগে, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে, শব-দাহের প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায়।[৬০] প্যালেস্টাইন থেকেও আয়তাকৃতি পাত্রে শবদাহের অবশেষ পাওয়ার সংবাদ আছে এবং এর সময়কাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দ।[৬১] শবদাহ প্রচলিত ছিল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ নাগাদ আনাতোলিয়ায়, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ নাগাদ দানিয়ুব উপত্যকার মধ্যবর্তী ভাগে[৬২] এবং ক্লাসিকাল টিম্বার সমাধি যুগে নিম্ন ভল্গা ও দক্ষিণ উরাল অঞ্চলে।[৬৩] মনুষ্য মুখাকৃতি সদৃশ পাত্রস্থ শব-দাহোত্তর অবশেষ দানিয়ুব উপত্যকায় পাওয়া গেছে এবং এই সব পাত্রের কতকগুলি তাম্রপ্রস্তর যুগের শেষ দিককার।[৬৪] এই উপত্যকার কয়েকটি শব-দাহোত্তর সমাধির সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৬৫] হোমারের সময়ে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৯০০) গ্রীসে শব দাহের সঙ্গে সমাধিদান প্রথা চলত।[৬৬] ইলিয়াডে শব-দাহের উল্লেখ আছে,[৬৭] আবার সেখানে দাহ-পরবর্তী সমাধিস্তূপের উল্লেখ আছে।[৬৮] ইটালিতে শব-দাহোত্তর সমাধির রীতি প্রচলিত ছিল। যে ভিল্লনোভার পূর্ববর্তী সংস্কৃতি খ্রীঃ পূঃ ১১০০-৯০০ অব্দে ইটালীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির বিস্তারকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল, তার থেকে জানা যায় যে, শব-দাহোত্তর সমাধি-দান ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল।[৬৯] সম্ভবতঃ প্রাচীন কেল্টিক সংস্কৃতির হলস্ট্যাট সমাধিক্ষেত্রে ৪৫৫টি শব-দাহের কবর এবং ৫২৫টি সমাধি পাওয়া গিয়েছিল।[৭০] এতে বোঝা যায়, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বা তারও পূর্বেকার ফ্রান্সে শব-দাহ প্রচলিত ছিল। শব-দাহের নমুনা দেখা যায় প্রধানতঃ জার্মেনী, পোলাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও স্কাণ্ডিনেভিয়াতে। প্রথাটির ধারণ ভিল্লনোভা সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। এই সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল হলস্ট্যাট সংস্কৃতি স্তর অতিক্রম করে সুইডেন পর্যন্ত।[৭১] প্রাচ্যে, হিন্দুকুশ ও পামির পবর্তমালার উত্তরে অবস্থিত তাজিকিস্তানের দক্ষিণে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়র্ধে উক্ত প্রথাটি বিস্তারলাভ করে। তুলখার 'টেপ' ও অরুক্তউ সমাধি ক্ষেত্রগুলিতে ব্রোঞ্জযুগের (খ্রীঃ পূঃ ১৩০০-৯০০) শেষ দিকের শতাধিক দাহ-পরবর্তী কবর পাওয়া গেছে।[৭২] তাজিকিস্তানের ৫০০ কিমি দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশের সোয়াট উপত্যকায় প্রথাটি দেখা যায়। গন্ধারে শব-ভস্মাধারে মানুষের মুখ দেখা যায় এবং এই প্রথার প্রবর্তনের কাল খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ নির্দিষ্ট করা হয়,[৭৩] যদিও তাজিকিস্তানের প্রাচীনতম দাহ-পরবর্তী কবরগুলির সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ১৩০০, ঐ অঞ্চলে প্রথাটির সূত্রপাত হয়েছিল আরও অনেক পূর্বে। কাবুল (কুভা) নদীর ধারা অনুসরণ করে দক্ষিণ তাজিকিস্তান থেকে গন্ধারে পৌঁছানো ছিল খুবই সহজ।[৭৪] খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ নাগাদ সোয়াত উপত্যকায় ঘলিগাইতেও প্রথাটি দেখা যায়। বেলুচিস্তানে গুমলায় হরপ্পা-সংস্কৃতি অবসানের পর আমরা যে-সব দাহ-পরবর্তী কবরের স্পষ্ট সাক্ষ্য পাই, সেখানে পশুদের বলিদান করে দাহের পরবর্তী শবদেহের সঙ্গে সমাধি দান করা হত।[৭৫]

শব-দাহের প্রথা প্রাক্-বৈদিক কাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল কি না, তা বিতর্কের বিষয়। জন মার্শাল মনে করেন, সিন্দু সভ্যতার সমৃদ্ধির কালে এই প্রথার প্রচলন ছিল।[৭৬] একই সময়ে তিনি বলেন, মহেঞ্জোদারোতে মৃত সংকার-সম্পর্কিত প্রমাণাদি খুব কম।[৭৭] তিনি আরও বলেন, সিন্ধুসভ্যতার চরম উন্নতিকালে মৃতের সংকারের কোনও সাক্ষ্য নেই।[৭৮] সিন্ধুসভ্যতার পরিণত স্তরে শব-দাহ প্রথার প্রচলন ছিল, মার্শালের এই মত তাঁর পরস্পর-বিরোধী উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা শক্ত।

ভাট্স্ ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি হরপ্পায় দাহ-পরবর্তী সমাধি পেয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৭৫টি ক্ষেত্রে পশুর হাড়-গোড় ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নি; কেবলমাত্র সমাধিপাত্রে মানুষের অদগ্ধ জঙ্ঘাস্থির কিছু অবশিষ্ট আছে।[৭৯] কিন্তু বেলুচিস্তানের[৮০] সমাধিগুলিতে প্রাপ্ত মানবাস্থি থেকে অনুমান করা হয় যে, হরপ্পাতেও দাহ-পরবর্তী সমাধি ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, বেলুচিস্তানে তাম্রপ্রস্তর যুগের স্তরে দাহ-পরবর্তী কবরগুলি পাওয়া গেছে সেই সব স্থানে, যেখানে সিন্ধুসভ্যতার প্রতীকী তৈজস পত্রাদি দেখা যায়।[৮১] সিন্ধু অথবা পাঞ্জাবে সিন্ধুসভ্যতার শেষদিকে দাহ-পরবর্তী সমাধিপাত্র দেখা যায়। সিন্ধু অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য বেলুচিস্তানেও এটি সত্য হতে পারে। ভাট্স্ উল্লেখ করেন যে, হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত এই জাতীয় সমাধিপাত্র শেষ ও মধ্যযুগের।[৮২] মার্শালের মত-অনুযায়ী, হরপ্পায় মৃতের সংকার সম্পর্কিত যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হল জনবসতির শেষ যুগে, যখন সম্ভবতঃ মহেঞ্জোদারোয় বসতির অবসান ঘটেছিল।[৮৩] মার্শাল তিনটি সমাধিপাত্রের আলোকচিত্র উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে, দুটি নিশ্চিতভাবে শেষযুগের এবং তৃতীয়টি সম্ভবতঃ একই সময়কালের।[৮৪] এর অর্থ হল, তিনটি পাত্রই খ্রীঃ পূঃ ১৬০০-এর পরবর্তী যুগের।

এইভাবে আমরা দেখি যে, সমাধিপাত্রগুলিতে মানুষের দেহাবশেষ প্রায় অনুপস্থিত। মনে হয়, পশু-পাখী প্রভৃতি পুড়িয়ে রান্না করা হত এবং মৃতের উদ্দেশ্যে পাত্রাদিতে রাখা হত। যেহেতু পশুপাখির সঙ্গে মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া যায় না, হরপ্পায় সম্ভবতঃ দাহ-পরবর্তী সমাধিদান প্রথা ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি এই প্রথার প্রচলন ছিল ধরেও নিই, হরপ্পা সংস্কৃতির পরিণত স্তরে এর প্রচলন ছিল না, খ্রীঃ পূঃ ১৭০০-এর পরবর্তীকালে এই প্রথা দেখা যায়। ভাট্স্ বলেন যে, 'হরপ্পায় এইচ' সমাধিক্ষেত্র সিন্ধুসভ্যতার শেষ দিকের।[৮৫] খ্রীঃ পূঃ ১৬০০-১৫০০ নাগাদ হরপ্পীয় যুগের শেষদিকে দাহ-পরবর্তী সমাধির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর কারণ ছিল সম্ভবতঃ ইন্দো-আর্য ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে হরপ্পার সম্পর্ক।

চিত্রিত ধূসর পাত্রাদি ও হরপ্পার শেষ দিকের স্তরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে দাহ-পরবর্তী সমাধির অভাবের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, খননকার্য যথেষ্ট হয় নি। রাজস্থানে হরপ্পাযুগের একটি বসতিতে সীমিত খননের ফলে পাঁচটি শব-দাহের

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৮৬] এটি হরপ্পার শেষ যুগের (খ্রীঃ পূঃ ১৬০০-১২০০) বসতি হতে পারে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০-৫০০) শব-দাহের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যদিও এপর্যন্ত উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন মেলে নি। অবশ্য, মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত কতকগুলি মৃত্তিকা-গহ্বর, স্তূপ ও সমাধি-টিলাগুলির দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা যায়, খ্রীঃ পূঃ ৬০০ এ ৩০০-এর মধ্যবর্তী সময়ে দাহ-পরবর্তী সমাধিদান প্রচলিত ছিল।[৮৭]

শব-দাহের পর অস্থিগুলি সমাধিস্থ করার কথা প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে।[৮৮] **শ্রৌত সূত্র** ও **গৃহ্যসূত্রে** অস্থি-সংগ্রহের বিধান আছে এবং **শতপথ ব্রাহ্মণে**[৮৯] অস্থিগুলির সমাধিদান এবং সমাধির উপর **শ্মশান** অথবা মৃতের স্তূপ নির্মাণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। তুলনা দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, একই পদ্ধতিতে দক্ষিণ-রাশিয়া, দক্ষিণ-উক্রেন ও ভল্‌গা অঞ্চলে **কুরগান**গুলি তৈরি করা হত। প্রাচীনতম বৈদিক রচনাগুলির অনেক পূর্ববর্তী সময়ে এই প্রথা অনুসৃত হ'ত।

ঋগ্‌বেদ ও **অথর্ববেদ** উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় যে, শব-দেহের সঙ্গে পশুদের সাধারণতঃ পোড়ানো হ'ত। **ঋগ্‌বেদে** অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়[৯০] দেখা যায় যে, শবদেহের সঙ্গে একটি ছাগকে অগ্নিদগ্ধ করা হ'ত। **অথর্ববেদ** অনুসারে[৯১] মৃত ব্যক্তির সঙ্গে একটি কর্মক্ষম বৃষকে আগুনে দগ্ধ করা হত। হোমার বলেছেন, ভেড়া, গরু, ঘোড়া, কুকুর ও মানুষদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহের সঙ্গে দলপতির শব-দেহ দাহ করা হ'ত।[৯২]

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর যে সব অনুশাসন আছে তাতে সমাধিস্থ মৃত ব্যক্তির খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে পশু-পাখি নিধনের বিধান দেওয়া হয়নি। যাই হোক, **আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে**[৯৩] বলা আছে যে, ব্রাহ্মণদের মৎস্য-মাংস দিয়ে খাওয়ালে **পিতরঃ** বা পূর্বপুরুষেরা সন্তুষ্ট হবেন। যদিও এই গ্রন্থটির তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৫০০-এর আগে হ'তে পারে না, এতে বৈদিক রীতি-প্রথার কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। **আপস্তম্ব** যে-যুগের স্মৃতি বহন করে তখন মানুষ অনেক বেশি নির্ভর করত আমিষ খাদ্যের উপর। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির জীবন ও সংস্কৃতিতে পশুপালন প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। লোকে বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরেও তাদের মাংস খাদ্য হিসাবে প্রয়োজন হবে। এই বিশ্বাসের নমুনা পাওয়া যায় ভারতে ও তার বাইরে। কিন্তু **কুরগান** সমাধিগুলিতে আমিষ খাদ্য সরবরাহের উল্লেখ বৈদিক যুগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পাওয়া যায় না।

পশুবলি ও অশ্বমেধ, মৃতের সৎকার, অগ্নি-সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান এবং **সোম**-বিশ্বাস—এসবের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংশয়ের অবকাশ রাখে না যে, বৈদিক আর্যদের আগমনের ফলে এসব ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে মধ্যএশিয়া ও ইউরোপের কোনও কোনও অংশে প্রচলিত ছিল।

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক

পুরুষ-প্রাধান্য

পুরুষ-প্রাধান্য ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, হল-কর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পুরুষোচিত গুণাবলী থাকায় ও নারীর যৌন-কামনা নিয়ন্ত্রণের জন্য পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু যেহেতু অশ্বারোহণের জন্য পুরুষোচিত গুণের প্রয়োজন ছিল, কর্ষণের সঙ্গে এটিও সমভাবে পুরুষ-প্রাধান্যের জন্য দায়ী। ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ ও আইনের দ্বারা পিতৃত্বের মুখ্যতা প্রমাণিত হয়। ল্যাটিনে 'পিতৃভূমি' বা **পেট্রিয়াপেটার** থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিশেষণ **পেট্রিয়াস, পেটার** থেকে উৎপন্ন এবং একমাত্র পিতৃজগৎকে বোঝায়। 'মাতা'র জন্য সম-সম্পর্কিত শব্দ নেই এবং **মেট্রিয়াস** শব্দটির অস্তিত্ব নেই। এর কারণ রোমান আইনে মাতার স্ব-অধিকারে কোনও কর্তৃত্ব বা স্বত্ব-স্বামিত্বের বিধান নেই।[১] রোমান আইন অনুসারে একজন রোমান গৃহস্বামীর **(পেটার ফ্যামিলিয়াস)** স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও দাস সমভাবে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার অধীনে বাস করত এবং সমভাবে রাষ্ট্রে আইনগত অধিকারের বাইরে ছিল।[২] স্ত্রীর উপর কর্তৃত্বের ইন্দো-ইউরোপীয় ট্রাডিশন ব্রাহ্মণ্য আইনের দ্বারা দৃঢ় হয়েছিল। মনু ঘোষণা করেছেন যে, স্ত্রী, পুত্র ও দাসের সম্পত্তিতে অধিকার নেই; তারা যা কিছু আয় করে তা হ'ল তাদের নিজেদের স্বত্বাধিকারীর সম্পত্তি।[৩] প্রাচীন ভারতীয় আইনপ্রণেতারা মনে করেন, নারী কখনই স্বাধীন নন।[৪] প্রাচীন আবেস্তা ও গ্রীক রচনাবলীতে পুরুষ-প্রাধান্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পিতৃতান্ত্রিকতার যে-সব চিহ্ন পাওয়া যায় তার প্রতিফলন ঘটেছে ইউরেশিয়ার সমাধিদান প্রথায়। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দে উত্তর ইউরোপে বঙ্কনীচিহ্ন যুক্ত পাত্র-সংস্কৃতির প্রতিনিধিরা তাদের দক্ষিণ দিকে পুরুষদের এবং বাম দিকে নারীদের সমাধি দিত।[৫] নলচিক নামে উত্তর ককেশাসের একটি স্থানে প্রাপ্ত সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে একথা সত্য।[৬] সমাধিক্ষেত্রটির সময়কাল প্রায় খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দ। আরব সাগরের দক্ষিণে তাজাবগিয়াব সংস্কৃতি ও তাজিকিস্তানের তুলখার সমাধিগুলি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।[৭] উভয়ই ছিল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আন্দোনোভো সংস্কৃতির ভিন্ন রূপ। তুলখার সমাধিগুলিতে পুরুষদের জন্য আয়তাকৃতি ও নারীদের জন্য গোলাকৃতি অগ্নি-রক্ষার স্থান ছিল।[৮]

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দে পোলাণ্ড অঞ্চলে ও বাল্টিক রাজ্যগুলিতে,[৯] খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে[১০] দানিউব অঞ্চলে এবং ইটালিতে[১১] কতকগুলি সমাধি থেকে মনে

হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে যজ্ঞানুষ্ঠানে বলিদান করা হত। এই সব অঞ্চলে অনেকগুলি সমাধিতে অশ্বের দেহাবশেষ ও অসংখ্য তামার জিনিষপত্র আছে। এগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতীক।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

কলিন রেনফ্রু কৃষিকে ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি-জ্ঞাপক লক্ষণ বলে মনে করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রাচীনতম কৃষকরা খ্রীঃ পূঃ সপ্তম সহস্রাব্দে আনাতোলিয়ায় বাস করত এবং কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১২] কিন্তু খ্রীঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ সহস্রাব্দে ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্তানভুক্ত বেলুচিস্তানে অন্যান্য কৃষিকেন্দ্রগুলি দেখা যায়। বস্তুতঃ, সমগোত্রীয় শব্দ এবং প্রাচিন গ্রন্থাদি (ঋগ্‌বেদ, আবেস্তা ও হোমারের রচনাবলী) থেকে দেখা যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয়দের মধ্যে কৃষির চেয়ে পশুপালন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার ফলে পশুসম্পদ উৎপাদন-বৃদ্ধি জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। প্রাচিন গ্রন্থগুলিতেও পশুপালনকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঋগ্‌বেদ গোধন আক্রমণ, লুণ্ঠিত সম্পদ ও গবাদি পশু-সম্পদের উল্লেখে পরিপূর্ণ।[১৩] আবেস্তায় চারণ-ভূমির জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা লক্ষিত হয়, কেননা তা থেকে আহার জুটত পশু ও মানব-সম্প্রদায়, উভয়েরই।[১৪]

আদি-ইন্দো-ইউরোপীয়রা সম্ভবতঃ তামার অস্ত্র-পাতি ব্যবহার করত। সংস্কৃত শব্দ অয়সের সদৃশ শব্দ আছে ল্যাটিন, গথিক ও প্রাচীন জার্মান ভাষায়।[১৫] । সাধারণতঃ এর অর্থ ধরা হয় তামা এবং পরবর্তী কালে শব্দার্থের প্রসারের ফলে এর অর্থ[১৬] করা হয় 'ব্রোঞ্জ' ও 'লোহা'। খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০-এর পর থেকে পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্যএশিয়া হ'য়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত কর্ষণ ও পশু-পালনের সঙ্গে তামার ব্যবহার প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রমাণিত। কোনও নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বা সময়কালে জীবিকা-নির্বাহের এই উপায়গুলিকে যুক্ত করা শক্ত।

ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ-ভিত্তিতে আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির যে উপাদানগুলির ধারণা করা যায় তাতে নব্যপ্রস্তর অর্থনীতির একটি বিকশিত স্তর লক্ষিত হয়। এই স্তরের আবির্ভাব খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সহস্রাব্দের মধ্যভাগের আগে হয় নি। উক্ত সংস্কৃতি হল নব্যপ্রস্তরযুগের দ্বিতীয় স্তরের যে-সময়ে অ্যাণ্ড্রু ও সুসান সেরাটের মতানুযায়ী[১৭] গৌণ উপাদাগুলির উৎপাদনে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। তাঁরা দেখিয়েছেন, অশ্বকেন্দ্রিক সংস্কৃতিগুলির লক্ষণ ছিল চক্রযান ও আরোহীযুক্ত অশ্ব, নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য, হল-কর্ষণ, নিবিড় পশুপালন, দুগ্ধ-জাত দ্রব্যাদি এবং তামা/ব্রোঞ্জের ব্যবহার। মারিজা

গিমবুটাস ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজের ভিত্তিতে ম্যালরি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনতম স্বীকৃত ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ ও ৩৫০০০-এর মধ্যে দক্ষিণ উক্রেনে শ্রেডনি স্টোগে এবং সেই সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল ডন ও নীপার নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়।[১৮] এই সংস্কৃতিতে পশুপালনের সম্পূরক ছিল কৃষি, শিকার ও মাছ ধরা; মাংস ও পরিবহনের জন্য অশ্বের ব্যবহার ছিল; এবং তাম্রনির্মিত অস্ত্রপাতিও কাজে লাগানো হ'ত।[১৯] পূর্বতন সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করতেন যে, শ্রেডনি স্টগ-অর্থনীতিতে[২০] পশুপালন ছিল মুখ্য ও অপরিহার্য। দ্বিতীয় স্তরের আবির্ভাব হয় য়ানমাইয়া সংস্কৃতিতে পূর্বদিকে ভল্গা নদীর ধারে খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ ও ২৫০০-এর মধ্যে। এটি ছিল শ্রেডনি স্টগ সংস্কৃতির বিকশিত রূপ। যদিও য়ামনাইয়া সংস্কৃতিতে পশুপালনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, এর বৈশিষ্ট্য ছিল শকটের ব্যবহার, যার অস্তিত্বের প্রথম সাক্ষ্য মেলে এই যুগে বাল্টিক-কাস্পিয়ান অঞ্চলে। পূর্ববর্তী যুগগুলির তুলনায় আরও বেশি তামা ব্যবহৃত হ'ত এবং আঞ্চলিক ধাতুসংগ্রহ-দ্রাবণের কেন্দ্র[২১] গড়ে উঠেছিল।

তৃতীয় স্তর দেখা যায় আন্দ্রোনোভা সংস্কৃতিতে, যার বিস্তার ঘটেছিল উরাল থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং মধ্যএশিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত বনাঞ্চল যুক্ত তৃণভূমি থেকে দক্ষিণে তাজিকিস্তান পর্যন্ত। এই অঞ্চলের অন্তর্গত আরল সাগর এবং আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নামে দুটি নদী। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২২০০ অব্দে এই সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছিল। অ্যালেনা কুজমিনা এই মত উপস্থাপিত করেন যে, ঋগ্‌বেদ ও আবেস্তায় সমভাবে দৃষ্ট বস্তুগত সংস্কৃতির প্রতিরূপ ছিল আন্দোনোভো সংস্কৃতি।[২২] ম্যালরি এই মত প্রকাশ করেন যে, "এর উদ্ভব ব্যাপারে মূলগত ঐক্য ছিল পন্টিক-কাস্পিয়ান অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত প্রতিবেশী অঞ্চলের";[২৩] কিন্তু এই সংস্কৃতির সৃষ্টিতে মধ্যএশিয়ার বিশেষ অবদান ছিল। যাই হোক, এটি স্পষ্ট যে, আন্দ্রোনোভো সংস্কৃতি ও পূর্বতন সোভিয়েত মধ্যএশিয়ায় আবিষ্কৃত অন্য কয়েকটি তৃণভূমি অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক ও আবেস্তীয় সংস্কৃতির সাধারণভাবে সাদৃশ্য রয়েছে। পশুবলি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, জনবসতির প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক-ক্রিয়াকলাপে এই সাদৃশ্য দেখা যায়।

৬. উপসংহারের দিকে

আর্য ও হরপ্পা সংস্কৃতি

এই রকম দাবি করা হয় যে, হরপ্পা সংস্কৃতি আর্যদের সৃষ্টি। অবশ্য, এই দাবি ভিত্তিহীন। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি মহান—মজুমদার, নীলকান্ত শাস্ত্রী, ভাণ্ডারকার ও রায়চৌধুরী, তাঁরা আর্যদের হরপ্পা সংস্কৃতির স্রষ্টা বিবেচনা করতেন। হরপ্পা সংস্কৃতির পরিণতি ঘটেছিল খ্রীঃ পূর্ব ২৫০০ থেকে ১৭০০-এর মধ্যে, অথচ বৈদিক যুগের জনগোষ্ঠীর এই দৃশ্যে আবির্ভাব পরবর্তীকালে। যদিও হরপ্পীয়দের সঙ্গে বহির্ভারতীয়দের যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আর্যদের সঙ্গে নিঃসংশয়ে যুক্ত বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানগুলির প্রাধান্য হরপ্পা-সভ্যতায় ছিল, এমনটি প্রমাণ করার মত কিছুই নেই। অর্থপূর্ণ যে, ঋগ্‌বেদের সংস্কৃতি ছিল পশুপালন ভিত্তিক ও অশ্বকেন্দ্রিক, অথচ হরপ্পা সংস্কৃতি অশ্বকেন্দ্রিক বা পশুপালন ভিত্তিক ছিল না।

আবেস্তা ও ঋগ্‌বেদের ভিত্তিতে যে-সংস্কৃতির রূপ-রেখা গড়ে তোলা হয়েছে, হরপ্পা সংস্কৃতিতে তার প্রতিরূপ নেই। হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিতে দেখা যায় একটি সুপরিকল্পিত নগরী আর রয়েছে কারিগরী শিল্প, বাণিজ্য ও শস্যাগারের প্রমাণ। হরপ্পার সৌধগুলি ছিল পোড়ামাটির ইঁটের তৈরি এবং নগরীর রাস্তাগুলি তাই দিয়ে আবৃত ছিল। অন্য দিকে, ঋগ্‌বেদে এসব উপাদান দেখা যায় না।

আর্যদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রকে দুর্গ-ধ্বংসকারী বা পুরন্দর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও 'পুর' কথাটি 'প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত বসতি' অর্থে ধরা হয়। আবার 'গ্রাম' অর্থও করা হয়। 'পুর' শব্দের দ্বারা যদি 'প্রতিরক্ষা সমন্বিত' বা 'সুরক্ষিত বসতি' ধরাও হয়, এটি সম্ভবতঃ হরপ্পার সময়কালের শেষ দিককার ক্ষুদ্র বসতি-সম্পর্কে প্রযোজ্য। এর দ্বারা বোঝানো হ'তে পারে সেই সব দুর্গগুলিকে যে-গুলি ধ্বংস হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ নাগাদ বেলুচিস্তান আফগানিস্তান ও সমীপবর্তী মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণাংশের অঞ্চলগুলিতে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে দানি মনে করেন যে, গুমলার সমাধিসংস্কৃতির প্রতিনিধিরা, যারা দাহ-পরবর্তী সমাধি দানের প্রথা অনুসরণ করত, তারা গুমলার হরপ্পা-সংস্কৃতি ধ্বংস করেছিল।[১] এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, ঋগ্‌বেদে আর্যদের অধীন কোনও প্রকৃত দুর্গের উল্লেখ নেই। আর্যরা অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেছেন, দুর্গ যেমন, তেমনিভাবে তিনি তাদের রক্ষা করুন।[২] পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, অসুরদের হাতে দেবতাদের পরাজয়ের কারণ এঁদের কোনও দুর্গ ছিল না।[৩]

হরপ্পা-লিপি থেকে সংস্কৃত পাঠোদ্ধারের ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়েছে। গত ৭০ বৎসর ধরে হরপ্পা-লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চলেছে এবং ৫০-এর অধিক সংখ্যক

পণ্ডিত এই চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত দ্রাবিড় ভাষার আদিরূপের অস্তিত্ব অনুমান করে কাজ করেন। মহাদেবন এই দিক দিয়ে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন। কম্পিউটারের সাহায্যে তিনি হরপ্পা-লিপির চিহ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর অবস্থান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত আদি-দ্রাবিড় বা তামিল ভাষার ভিত্তিতে যাঁরা হরপ্পা-লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মত পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেন নি। এলামাইট, সুমেরিয়, মিশরীয় প্রভৃতি অ-ইন্দো-ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষার ভিত্তিতে হরপ্পা-লিপি পাঠের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেউই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন নি। তবে যাঁরা আদি-দ্রাবিড় বা অন্যান্য অ-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তিতে লিপি পাঠের চেষ্টা করেছেন তাঁদের সংখ্যা সর্বাধিক।

ইন্দো-আর্য ভাষায় হরপ্পা-লিপি লিখিত হওয়ার একটি সম্ভাবনা স্পষ্টই থেকে যায়। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির আবির্ভাব হয় এবং তারপর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হরপ্পা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগুলির উপস্তর প্রমাণ করে যে, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীনতম ভাষা ইন্দো-আর্য নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত বেলুচিস্তানে যে ব্রাহুই ভাষা পাওয়া যায়, তা দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহুই ভাষা-ভাষী এলাকাটি সম্ভবত সেই বৃহত্তর অঞ্চলের অংশ, যেখানে দ্রাবিড় ছিল কথ্য ভাষা। বর্তমানে এটি চারিদিকে ইন্দো-আর্য ভাষা-ভাষী সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপের মত। কিন্তু প্রাচীনকালে এর সঙ্গে যোগ থাকতে পারে বর্তমান ইরাণ-ভূখণ্ডের অন্তর্বর্তী আদি দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী বসতিগুলির। হার্মাটিয়া এগুলিকে কোপেত দ্যাগ এবং সম্ভবতঃ সহ্র-ই-সোখতার বসতি বলে সনাক্ত করেছেন।[৪] ইন্দো-আর্য বা আদি-ভারতীয়রা উপমহাদেশের এই অংশে প্রথম বসতি করেছিল এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্কের কারণে তারা দ্রাবিড় থেকে উৎপন্ন অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গ্রহণ করেছিল। এই শব্দগুলি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ থেকে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না; কারণ ভারতীয় উপদ্বীপে লেখমালায় দ্রাবিড় ভাষার উপস্থিতির কাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০-এর আগে নয় এবং দক্ষিণে এই ভাষার আগমনের কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ এর আগে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সম্প্রতি দেখানো হয়েছে যে, দ্রাবিড় ভাষা এলামাইট ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। এলামাইটরা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে দক্ষিণ ইরাণে এক বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং তারা সুমেরিয় লিপির নিকটতর একটি লিপির উদ্ভব করেছিল। এই লিপিকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে রাখা যেতে পারে। একে বলা যেতে পারে আদি-এলামাইট লিপি। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দে দক্ষিণ ইরাণে ইন্দো-আর্যদের উপস্থিতি ভাবা যায় না, কারণ সে-সময় সেখানে ছিল শক্তিশালী এলামাইট রাজ্য। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের এলামাইট লেখমালায় প্রাপ্ত ভাষাকে দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ভাষাবিদ ম্যাক্ আলপিন মনে করেন যে, এলামাইট ও দ্রাবিড় উভয়েই একই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত এবং দাবী করেন যে, একটি আদি এলামাইট-দ্রাবিড়

ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তাঁর মতে বেলুচিস্তানের ব্রাহুই এই ভাষা থেকে উৎপন্ন এবং উত্তরাঞ্চলীয় দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত। আদি-এলামাইট-দ্রাবিড় ভাষায় পশুপালন বিষয়ক শব্দাবলীর উপর ম্যাক্ আলপিন আলোকপাত করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দাবলীতে পরিবর্তন ঘটেছিল।[৫] বিশেষ অর্থপূর্ণ যে, আদি-এলামাইট দ্রাবিড় ভাষায় ইঁটের মাত্র একটি প্রতিশব্দ আছে। এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, হরপ্পা ও ব্রোঞ্জযুগের অন্যান্য নাগরিক সভ্যতায় ব্যাপকভাবে ইঁটের ব্যবহার করা হত। হরপ্পা-সংস্কৃতির অবসানের পর উত্তর ভারতে এ পর্যন্ত খ্রীঃ পূঃ ৩০০ পূর্ববর্তী কোনও পোড়ামাটির ইঁটের সন্ধান পাওয়া যায় নি, যদিও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সম্ভবতঃ কাঁচামাটির ইঁটের উল্লেখ আছে। ম্যাক্ আলপিনের মতানুসারে, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে আদি-এলামাইট-দ্রাবিড় ভাষায় ভাঙ্গন ধরে। এই ঘটনার সঠিক তারিখ যাই হোক না কেন, ঐতিহাসিকেরা ক্রমশঃ এলামাইট ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করছেন যে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির অন্যতম হ'ল ব্রাহুই।[৬] এইসব থেকে প্রতীতি হয় যে, প্রাক্-আর্যগোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত এক বিশাল এলাকা অবস্থিত ছিল দক্ষিণ ইরাণ থেকে আফগানিস্তান হয়ে বেলুচিস্তান পর্যন্ত। এই অঞ্চলে ইন্দো-ইরাণীয় ও ইন্দো-আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিল খ্রীঃ পূঃ ২০০০-এর পর।

এই রকম যুক্তি দেখানো হয় যে, আর্যদের বিশিষ্টতার প্রতীক অগ্নিবেদীর সন্ধান পাওয়া গেছে লোথাল ও কালিবঙ্গানে। কিন্তু অর্থপূর্ণভাবে হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোতে অগ্নিবেদীর অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায় নি।[৭] ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে, যে মৃতের সৎকার-বিধি বৈদিক জাতিগুলি পছন্দ করতেন, তা পরিণত হরপ্পা স্তরে প্রচলিত ছিল না।

একটি 'শিব'মূর্তির আবিষ্কারকে ভিত্তি করে হরপ্পা সংস্কৃতির আর্যলক্ষণ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সীলের উপর কয়েকটি পশুর দ্বারা পরিবৃত একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু একে পশুপতি শিব বলে মানা যায় না।[৮] প্রাচীনকালে মধ্যএশিয়া ও অন্যত্র একই রকম শৃঙ্গযুক্ত একাধিক মূর্তি পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদে যদিও অসংখ্য দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি আছে, তার একটিতেও শিবের উল্লেখ নেই।

হরপ্পায় খননের ফলে অনেক নর-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে। এবং এর মধ্যে কোনওটিকে আর্যবৈশিষ্ট্য-যুক্ত মনে করা যায় না। এই কঙ্কালগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তার ফলে মনে হয়, কোনও জাতি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে এসে পশ্চিম এশিয়ায় বাস করেছিল। দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল আদি-অস্ট্রাল জাতি এবং তাদের দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্যগুলি দ্রাবিড় জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়। আদি-অস্ট্রাল জাতি বাস করে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে। তৃতীয় শ্রেণী হ'ল মঙ্গোলয়েড জাতি এবং এই শ্রেণীর একটি মাত্র কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত হরপ্পায় প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি থেকে আর্যদের দৈহিক গঠনের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি অবশ্যই একটি বিতর্কিত বিষয়।

এই রকম যুক্তি দেখানো হ'য়, পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্যরা হরপ্পা-সংস্কৃতির স্রষ্টা ছিল।[৯] কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে হরপ্পা সংস্কৃতির কোনও মিল নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ঋগ্বেদের পশুপালক সমাজ প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর হয়েছিল। লোকে লোহার ব্যবহার করত, যদিও এই ব্যবহার যুদ্ধ ও শিকারে সীমিত ছিল। বৈদিক গ্রন্থাদিতে লোহার অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ আছে।[১০] হরপ্পা সংস্কৃতিতে লোহার ব্যবহার নেই, সেখানে ব্রোঞ্জ ও প্রস্তরের হাতিয়ার ব্যবহার করা হ'ত। তা ছাড়া, হরপ্পার বিশিষ্ট কারিগরী শিল্প, বাণিজ্য ও নাগরিক জীবন পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে স্পষ্টত অনুপস্থিত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম সারির প্রায় সব পণ্ডিত মনে করেন যে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে। যেহেতু বিকশিত হরপ্পা সংস্কৃতির সমাপ্তি হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ নাগাদ, এই সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য পরবর্তী বৈদিক যুগের জনগোষ্ঠীকে দায়ী করা যায় না।

সারকথা

উপরে যে উপাদানগুলি আমরা বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলি দ্বারা ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা আর্যসংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু তাদের ব্যবহারে স্থান ও কালের পার্থক্য দেখা যায়। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ সহস্রাব্দে কৃষ্ণ সাগর ও ভল্‌গা অঞ্চলে গৃহপালিত অশ্বের ব্যবহার দেখা যায়। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের রথ-চক্র ও গণ্ড-আবরণ (অশ্বের) কৃষ্ণসাগর-কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে দেখা যায়, যদিও ভল্‌গা অঞ্চলে আন্দ্রোনোভো সংস্কৃতিতে খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ নাগাদ চক্রের অর দেখা যায়। পশুবলির প্রাচীনত্ব খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সহস্রাব্দ, কিন্তু অশ্বমেধ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আগে দেখা যায় না এবং ভারতেই সীমিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় চতুর্থ সহস্রাব্দে উত্তর ইউরোপ ও ককেশাস অঞ্চলে পুরুষ প্রাধান্য দেখা যায়। অশ্ব-ব্যবহারকারীদের মধ্যে শব-দাহ প্রথা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-এর আগে দেখা যায় না, যদিও কাজাকাস্তানে এই প্রথার প্রাচীনত্ব খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সহস্রাব্দ। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ নাগাদ অশ্ব-ব্যবহারকারীদের সোম ও অগ্নি-পূজায় বিশ্বাস দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় খ্রীঃ পূঃ ২৩০০-২১০০ নাগাদ আদি-ইন্দো-আর্য ভাষার প্রাচীনতম ব্যবহার দেখা যায় লেখমালায়। অতএব, আমাদের দ্বারা রচিত আর্যসংস্কৃতির চিত্রটির সময়কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০-এর আগে হ'তে পারে না।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উভয় শাখার ভাষাভাষীদের কতকগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সদৃশ। উভয় গোষ্ঠীই রথ টানা, আরোহণ করা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অশ্বের ব্যবহার করত। ইন্দো-ইউরোপীয়দের উভয় শাখাই শব-দাহ প্রথা অনুসরণ করত এবং অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল, এমন কি পশ্চিম শাখা-ভুক্ত কোনও কোনও সদস্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত। উভয় শাখাতেই পুরুষ-প্রাধান্য স্বীকৃতি ছিল। যদিও বলপূর্বক নারীকে

হত্যা করে তার স্বামীর সঙ্গে সমাধিস্থ করার প্রথা প্রথম দেখা দিয়েছিল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দে পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাজ্যগুলিতে, এই প্রথা শকদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। যাই হোক, অগ্নি ও সোমে বিশ্বাসের সঙ্গে পশুবলি ভারতীয় ও ইরাণীয়দের বৈশিষ্ট্য দান করেছিল, কিন্তু শব-দাহ ও অশ্বমেধ ভারতীয়দের অধিক বিশিষ্টতা-যুক্ত করেছিল।

এইসব উপাদানের মধ্যে কয়েকটি অ-ইন্দো-ইউরোপীয়দের নিকট থেকে ধার করা হয়েছিল। আর্য শব্দটিই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পূর্বশাখায় গৃহীত হয়েছিল এবং এটিকে বিভিন্ন রূপে রক্ষা করার জন্য যথাযোগ্য ব্যাকরণের বিধি-বিধান তৈরি করা হয়। আবার, শব-দাহ প্রথা সম্ভবতঃ পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যএশিয়া থেকে এসেছিল এবং সোম ও অগ্নি-বিশ্বাস সম্ভবতঃ মধ্যএশিয়ার কোনও কোনও জাতির নিকট থেকে নেওয়া হয়েছিল। অর-যুক্ত চক্র মেসোপোটেমিয়ার দান হতে পারে। যাই হোক, এই উপাদানগুলি অবশেষে ঐক্যবদ্ধ হয় অশ্বের মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নেতাদের নিয়ন্ত্রণে এবং এক ভাষা অথবা নিকটতম সূত্রে গ্রথিত তার আঞ্চলিক রূপগুলির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা বিকশিত শক্তির মাধ্যমে। পুরোহিতরা হয়ত বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত আচার-অনুষ্ঠানকে সমন্বিত করার জন্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ব্যবহার করেছিলেন। ভাষার দ্বারা বিভিন্ন কৌমের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সুবিধা হয়েছিল এবং কারিগরি বিদ্যার আদান-প্রদান অগ্রায়িত করেছিল। ক্রমশঃ অশ্ব-ব্যবহারকারী গোষ্ঠী মূল নিজস্ব ও অন্যের নিকট থেকে গৃহীত উপাদানগুলির সমন্বয় সাধান করেছিল এবং আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০-এর মধ্যে প্রায় স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল।

প্রধানতঃ **ঋগ্‌বেদ** ও **আবেস্তা** থেকে আর্য-সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রমাণাদি সংগৃহীত হয়। উভয় গ্রন্থে যে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পাওয়া যায়, তাতে আন্দ্রোনোভো প্রেক্ষাপটে আর্যদের সাধারণ সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। আমরা অশ্ব ও সামাজিক-ধর্মীয় রীতি-নীতি সম্পর্কিত যে-তথ্যাদি উপরে বিশ্লেষণ করেছি, খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ থেকে ৬০০ ব্যাপ্ত সময়কালের পশ্চিম এশীয় লেখমালা দ্বারা তা সমর্থিত হয় ও তাতে সংযোজনও ঘটে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যাদি থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি প্রত্নতত্ত্বের দ্বারা অনেকাংশে সমর্থিত হয়। অশ্ব-ব্যবহারকারী গোষ্ঠীগুলি পরপর কোন্ পথ ধরে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজ নয়, এ কথা সত্য। তথাপি মনে হয়, আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি মধ্যএশিয়ায় প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যের স্বাদ গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ইরাণ, আফগানিস্তান ও ভারত উপমহাদেশে আরও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

১. এই শব্দগুলির অধিকাংশই ব্যবহার করেছেন টি. বারো, মারিজা গিমবুটাস, জে. পি. ম্যালরি, এ্যাস্‌কো পারপোলা, কলিন রেনফ্রু ও অন্যান্যরা।

২. উল্লেখিত জে. পি. ম্যালরি কর্তৃক তাঁর গ্রন্থেঃ *In Search of the Indo-Europeans*, Thomes and Hudson, London, 1991, p. 276, fn. 27.

৩. Asko Parpola, 'The Coming of the Aryans to Iran and India and the cultural and ethnic identity of the dāsas', *International Journal of Dravidian Linguistics*, XVII, No,2, p.116 with fn. 163.

৪. তদেব, p. 123 with fn. 203.

৫. ঋগ্‌বেদ সংহিতা সায়ন ভাষ্য সহ, ৫ খণ্ড, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, পুনা, ১৯৩৩-৩৫। প্রথম ছয়টি মণ্ডলের ইংরাজী অনুবাদ, এইচ. এইচ. উইল্সন, লণ্ডন, ১৮৫০-৫৭. রাল্‌ফ টি. এইচ. গ্রিফিতের অনুবাদঃ Hymns of the RgVeda, পুনর্মুদ্রণ, মোতিলাল বানারসিদাস, দিল্লী, ১৯৮৬, VII. 5. 2-3.

৬. তদেব, IX. 41.1-2.

৭. তদেব, IX. 73.5.

৮. তদেব, I. 130.8.

৯. H. W. Bailey, 'Iranian Arya and Daha', *Transactions of the Philological Society*, 1959, 71-83.

১০. Emile Benveniste, *Indo-European Language and Society*, Faber and Faber, London, 1973.

১১. Colin Renfrew, *Archaeology and Language: The puzzle of Indo-European origins*, Penguin, Harmondsworth, 1989.

১২. সোয়াট উপত্যকায় সব বসতিগুলির অধিকৃত স্তরগুলিতে কৃষ্ণ-ধূসর চক্‌চকে পাত্রাদি দেখা যায়। এর সম্বন্ধ হল উত্তর ইরাণের সেই পাত্রাদির সঙ্গে যার বিস্তার হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ থেকে। উপত্যকায় কয়েকপ্রকার পাত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় উত্তর আফগানিস্তানে ড্যাসলি থেকে প্রাপ্ত পাত্রাদির সঙ্গে, যার মধ্যে রয়েছে ধূসর রঙের চাকচিক্যযুক্ত পাত্র। ড্যাসলির পাত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে শাহ টেপ, টেপ হিসসার ও তুরেগ টেপ থেকে প্রাপ্ত পাত্রাদির সঙ্গে। গিওরগিও স্ট্যাসুলঃ *Prehistoric and Protohistoric Swat, Pakistan* (C. 3000-1400 BC), Rome, ISMEO, 1987, p. 122.

১৩. Mallony, *In search of the Indo-Europeans*, pp. 162, 164, 182, 244-50.

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. R. Mortonsmith, "What is in a name (in ancient India)?' *Journal of Indo-European Studies* (সংক্ষেপে (JIES), 12, 1984, p. 306.

২. ঋগ্‌বেদ, ১ম, ১৬২-৬৩

৩. A. A. Macdonell and A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, মোতিলাল বানারসিদাস. দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬৭, পৃ. ৪২-৪৩
৪. *The Iliad.* tr. E.V. Rieu, Penguin, Harmonodsworth, reprint, 1986 (BK XXIII), pp. 412-419.
৫. *The Odyssey,* Tr. E.V. Rieu, Penguin, Harmondswoth, reprint, 1986 (BK. VIII) p. 125.
৬. *Sacred Books of the East* (SBE), XXIII, *The Zend Avesta,* Tr. J. Darmesteter, Pt. 2, Motilal Banarasidas, Delhi, reprint, 1988, pp. 136,138, 152, 157.
৭. তদেব, পৃ. ১৪২, ৩৫০-৫১; ৩১শ, পৃ. ২৫৬, ২৭১
৮. তদেব, ২১শ, পৃ. ২১৯
৯. তদেব, ২৩শ, পৃ. ৩২৮, ৩৪০
১০. তদেব, পৃ. ৩২৪-২৯; দ্রষ্টব্য ৩১শ, পৃ. ২৩৫, ২৪৭, তৎসহ পাদটীকা ৪৯, পৃ. ২৫০
১১. *SBE,* IV. *The Zend Avesta,* Pt. I. Introduction, p. XCVI. p. 31.
১২. তদেব, ৩১শ, পৃ. ১২০, ১৭৩-৭৪
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৩, ১৯৯, ২০৪, ২১৬, ২৭০-৭১, ২৭৬
১৪. তদেব, ২৩শ, পৃ. ১৩৬, ১৩৮
১৫. তদেব, পৃ. ১২৪ পাদটীকা ৩ সহ
১৬. *An Encyclopaedia of Indian Archaeology* (*EIA*). ed. A. Ghosh, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1989. vol. I. p. 4.
১৭. তদেব, পৃ. ৩৯-৪১; H. D. Sankalia, *The Prehistory of India and Pakistan,* (*PPIP*), new edn. Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona, 1974, pp. 271-72. এটা অদ্ভুত যে, EIAI এর পৃ. ৪এ জি. এল. বাদাম বাগোরে গৃহপালিত অশ্বের উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পৃ. ৩১৪-তে তিনি বাগোরে প্রাপ্ত পশুদের তালিকায় অশ্বকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। Cf. Gregory L. Possehl and Paul C. Rissman,, 'India', *Chronologies in World Archaeology,* Third edn, ed. R. W. Ehrich, vol. I, The University of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 475.
১৮. G. R. Sharma, V. D. Mishra, D. Mandal, B. B. Mishra and J.N. Pal; *Beginnings of Agriculture,* Abinash Prakashan, Allahabad, 1990, pp. 220-223 ২২১ পৃষ্ঠায় পাদটীকা।
১৯. *EIA,* I. p. 76.
২০. অলচিনের মত উদ্ধৃত সাঙ্কালিয়া দ্বারা PPIP, p. 325.
২১. *EIA,* I. p. 362.
২২. তদেব, পৃ. ২৮২
২৩. তদেব, ও সাঙ্কালিয়ার *PPIP,* I. p. 323.
২৪. *EIA,* I. p. 338.
২৫. "Comments by Marija Gimbutas on David A. Anthony, "The "Kurgan Culture", Indo-European origins, and the domestication of the horse; A reconsideration', *Current Anthropology,* vol. 27, No. 4, Aug-Oct, 1986, p. 306; G. Matyushin,

1986, quoted in M. Zvelebi and K. V. Zvelebil, 'Agricultural Transition and Indo-European dispensals', *Antiquity*, vol. 62, No. 236, Sept. 1988, p. 581.

২৬. Marija Gimbutas, *Current Anthropology*, vol. 27, No.4, Aug-Oct, 1986, p. 306.

২৭. I. M. Diakonov, "On the original home of the speakers of Indo-Europeans" *The Journal of Indo-European Studies*, vol. 13,1985, p. 168, fn. 29.

২৮. A. H. Dani and V. M. Masson e.d.: *History of Civilizations in Central Asia*, I, UNESCO, Paris, 1992, p. 191.

২৯. তদেব, পৃ. ২১৭

৩০. R. S. Sharma: *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India*. 3rd edn. Motilal Banarasidas, Delhi, 1991, pp. 165-66.

৩১. *The Iliad*, BK. XXIII, pp. 419-21.

৩২. Mallyry: *In Search of the Indo-Europeans*. p. 274, fn. 20. 1, pp. 275-76, fn. 25.

৩৩. তদেব, পৃ. ২৭৪-২৭৫, পাদটীকা ২৫

৩৪. Dani and Masson, ed. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৪৭

৩৫. Parpola: 'The Coming of the Aryans', p. 143.

৩৬. Dani and Masson, ed. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

৩৭. J. H. Crouwel and M. A. Littauer quoted in Mallory, *In Search of the Indo-Europeans*, p. 41.

৩৮. তদেব

৩৯. Parpola, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩, cf. Henry-Paul Francfort: 'New Data Illustrating the carly contacts between Central Asia and the North-West of the Sub-continent', *South Asian Archaeology*, 1989, ed. Cadtherine Jarrige, Prehistory Press, Madison, 1992, p. 99.

৪০. Parpola, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

৪১. Richard Maedow: 'Continuity and Change in the agriculture of the Great Indus. Valley; The palaeo-ethnobotanical and zooarchaeological evidence', *Old Problems and New Perspectives in the Archaeology of South Asia*. ed. J.M. Kenoyer, University of Wisconsin, 1989, p. 70 quoted by G. Stacul in *South Asian Archaeology*, 1989, p. 268; cf. Jim. G. Shaffer, 'Indus Valley, Baluchistan and the Helmand', *Chronologies in Old World Archaeology*, ed. R.W. Ehrich, vol. I, 1992, p. 459.

৪২. A. H. Dani, *Recent Archaeological Discoveries in Pakistan*, UNESCO and The Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo, 1988, p. 63.

৪৩. Sankalia. *PPIP*, p. 330.

৪৪. Parpola, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫, ১৫৯

৪৫. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৪৬. Parpola, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৫

৪৭. Cf. Georgio Stacue, "Swat, Pirak and connected problems (mid-2nd millennium BC.)", *South Asian Archaeology 1989,* ed, Catherine Jarrige, Prehistory Press, Madison, 1992, pp. 267-70.

৪৮. *EIA*, II. p. 424.

৪৯. সাম্প্রতিক খননকার্যের ভিত্তিতে এম. কে ধবলিকারের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ।

৫০. *EIA*, I, p. 4; II, p 274.

৫১. S. R. Rao, *Lothal: A Harappan port town,* Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 78. Acrhaeological Survey of India, New Delhi. 1979, p. 219.

৫২. রিচার্ড মেডো ও. আর.এস.ভিসট্‌-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদ।

৫৩. Rao, *Lothal* p. 219.

৫৪. *EIA*, I, p. 90.

৫৫. *EIA*, II, p. 64.

৫৬. তদেব, পৃ. ১৬৪

৫৭. *EIA*, I, pp. 107-108.

৫৮. তদেব, পৃ. ৩৩৭

৫৯. তদেব

৬০. ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের এ. কে. প্যাটেলের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদ।

৬১. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪; J. P. Joshi, *Excavations at Bhagawanpura 1975-76,* Archaeological Survey of India, New Delhi, 1993, pp. 29, 144, 147.

৬২. *EIA*, II. p. 164.

৬৩. R. C. Gaur, *Excavations at Atranjikhera, Early Civilization of the Upper Ganga Basin.* Motilal Banarasidass, Delhi, 1983, p. 462.

৬৪. *EIA*, I, pp. 108, 338.

৬৫. তদেব, পৃ. ৩৩৮

৬৬. *Ancient India,* Nos. 10-11 (1954-55), p. 86, plate 42, fig. 3.

৬৭. R. C. Gaur পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬-৬৯

৬৮. *EIA*, I. p. 339.

৬৯. *Indian Archaeology—A Review* (সংক্ষেপে (*IAR*). 1988-89. Archaeological Survey of India, New Delhi, p. 88.

৭০. U. C. Chattopadhayay, 'Report on faunal remains in Narhan', Purushottam Singh, *Excavations at Narhan* (1984-89), Banaras Hindu University and D. K. Publishers, New Delhi, 1994, p. 251-52 দ্রষ্টব্য *SAR* 1984-85, p. 90, *IAR* 1985-86, p. 123 Purushottam Singh and Makkhan Lal, 'Narhan: 1983-85-A Preliminary report of archaeological exavations', *Bharati,* NS., No. 3, 1985, pp. 120-21. Narhan Period I এর সময়কালের জন্য *IAR*, 1988-89, p. 110.

৭১. *IAR*, 1984-85, pp. 90-91.

৭২. *IAR*, 1985-86, p. 123.

৭৩. *IAR*,1984-85, p. 92.

৭৪. 'Register of Antiquities'-এর ভিত্তিতে বি. পি. সিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৭৫. A. K. Narain and T. N. Roy, *Excavations at Rajghat*, part II, Banaras Hindu University, Varanasi, 1977, pp. 8-9.
৭৬. A. K. Narain and T. N. Roy, *The Excavations at Prahladpur* (March-April. 1963) Banaras Hindu University, Varanasi, 1968, p. 13, 45-46.
৭৭. Narain and Roy, *Excavations at Rajghat*, Part II, pp. 8-9.
৭৮. *EIA*, II, p. 89.
৭৯. Krishna Deva and V. Mishra, *Vaishali Excavationls*: 1950, Vaishali Sangha, Vaishali, 1961, p. 56; B. P. Sinha and S. P. Roy, *Vaishali Excavations*, 1958-62, Directorate of Archaeology and Museums, Patna, 1969, p. 160.
৮০. বি. এস. ভার্মা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
৮১. B. P. Sinha and B. S. Verma, *Sonpur Excavations*, (1956 and 1959-62), Directorate, of Archaeology and Museums, Patna, 1977, pp. 100, 119
৮২. B. P. Sinha and L. A. Narain, *Pataliputra Excavations*, 1955-56, Directorate of Archaeology and Museums, Patra, 1970, pp. 43-44.
৮৩. *IAR*, 1971-72, p. 5 and pl XI B.
৮৪. তদেব
৮৫. Sinha and Narain, *Pataliputra Excavations*, 1955-56, p. 10.
৮৬. *EIA*, I, p. 136.
৮৭. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ৫ম, ৩.৩.৩. (মাধ্যন্দিন সংস্করণ), সম্পাদনা : ভি. শর্মা গৌড় ও সি. ডি. শর্মা, কাশী, সম্বৎ ১৯৯৪-৯৭। অনুবাদ J. Eggeling, *S. B. E. XII*, XXVI. XLI, XLIII and XLIV, reprint, Motilal Banarasidas, Delhi, 1963.
৮৮. *EIA*, I, p. 337.
৮৯. তদেব
৯০. এ. কে. প্রসাদ থেকে পাওয়া তথ্য।
৯১. বি. এস. ভার্মা থেকে পাওয়া তথ্য।
৯২. *EIA*, I, p. 336.
৯৩. Gaur, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪
৯৪. Sinha and Verma, *Sonpur Excavations*, pp. 123-25.
৯৫. Sinha and Narin, *Pataliputra Excavations, 1955-56*, p. 47.
৯৬. Sinha and Narain, *Vaishali Excavations*, pp. 202-203.
৯৭. বি. এস. ভার্মা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
৯৮. Sinha and Verma, *Sonpur Excavations*, pp. 124-125.
৯৯. *IAR, 1985-96*, p. 8.
১০০. Sinha and Verma, *Sonpur Excavations*, p. 95.
১০১. M. A-Littauer and J. H-Groutrel, *Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East*, E. J. Brill Lieden, 1979, quoted in Henri Paul Francfort, 'New data illustrating the early contacts between Central Asia and the north-west of the Sub continent, *South Asian Archaeology 1989* ed. C. Jarrige, Prehistory Press, Madison, 1992, pp. 97-102.

১০২. David W. Anthony, 'The 'Kurgan Culture', Indo-Euopean origins, and the domestication of the horse: A reconsidertion', *Current Anthroplogy,* vol. 27, No, 4, Aug-Oct. 1986, pp. 291-313.

তৃতীয় অধ্যায়

১. *The Cambridge Ancient History,* vol. I, Pt. II, 3rd edn, ed. I.E.S Edwards et al, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, p. 831.
২. তদেব, পৃ. ৮৩৬
৩. *Cambridge Ancient History,* vol, Pt.1, 3rd. edn, pp. 140-44; এক্ষণ (সূত্রধর) ও ব্যবহৃত হয়; Pt II, p. 833, Mallory, *In Search of the Indo-Europeans,* pp. 24-30.
৪. J. Harmatta, 'The emergence of the Indo-Iranians: 'The Indo-Iranian languages',; *History of Civilizations,* I, ed. Dani and Masson, p. 374.
৫. *The Iliad,* Bk XXIII, p. 417.
৬. Georges Roux, *Ancient Iraq,* second edn, Penguin, Harmondsworth, 1980, pp. 227-28.
৭. তদেব, পৃ. ২৩০
৮. তদেব, পৃ. ২১৭-১৮; ম্যালরি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৪৩
৯. T. Burrow, 'The Proto-Indo-Aryans', *Journal of the Royal Asiatic Society,* 1973. pp. 123-40.
১০. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮
১১. তদেব, পৃ. ৩০-৩৩
১২. Georges Roux, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮
১৩. *Sub voce,* 'মুষক', Monier-Williams, Sanskrit. English Dictionary.
১৪. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
১৫. Burrow, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩, ১৩৯-৪০

চতুর্থ অধ্যায়

১. Mallory, *In Search of the Indo-Europeans,* pp. 135-138.
২. Benveniste, *Indo-European Language and Society,* pp. 482, 484, 486.
৩. Bruce Lincoln, *Priests, Warriors and Cettle,* University of California Press, Berkely and Los Angeles, 1982, pp. 65-66.
৪. *The Iliad,* Bk XXIII, 416, cf, *The Odyssey,* Bk, XI, p. 172.
৫. Lincoln, পূর্বোক্ত, অধ্যায় ৪, ১৮
৬. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮
৭. তদেব, পৃ. ২০৩
৮. তদেব, পৃ. ২১৪-২১৫

৯. *SBE*, XXIII, *The Zend Avesta*, pt, 2, pp. 62-63, 79; cf. *SBE*, XXXI, p. 120 with fn. 1, pp. 213-14.
১০. *SBE* IV, pp. 232-33.
১১. তদেব, ৫৪ খণ্ড এবং *শতপথ ব্রাহ্মণ*, পঞ্চমভাগ, পৃ. ৫১৭
১২. Rao, *Lothal*, পৃ. ২১৮
১৩. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ১৩শ, ১-৫
১৪. *The Iliad*, Bk. *XXIII*, p. 417.
১৫. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
১৬. তদেব
১৭. L. Renou, *Vedic India*, Indological Book House. Varanasi, 1971, pp. 109, 136.
১৮. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
১৯. তদেব
২০. তদেব, পৃ. ২২১
২১. V. J. Gening, 'The Cemetery at Sintashta and the early Indo-Iranian Peoples', *The Journal of Indo-European Studies*, VII, 1979, p. 21.
২২. Sankalia, *PPIP*, 1974, p. 350.
২৩. Rao, *Lothal*, pp. 216-17.
২৪. তদেব, পৃ. ৯৬-৯৮; ২০-২১, ২১৬-১৭
২৫. তদেব, পৃ. ২১৬
২৬. তদেব, পৃ. ৯৭-৯৮, চিত্র ১৫
২৭. P. V. Kane, *History of Dharmaśāstra*, vol. II pt. 2, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974, p. 989.
২৮. এক প্রক্রম দুই বা তিন পদের সমান, এবং এক পদ ১২-১৫ অঙ্গুলের। তদেব, পাদ টীকা ২২৩৯
২৯. Rao, *Lothal*, p. 217.
৩০. তদেব, পৃ. ৩৯
৩১. B. B. Lal, 'Some reflections on the structural remains at Kalibanga', in B. B. Lal and S. P. Gupta eds, *Frontiers of the Indus Civilization*, Books and Books, New Delhi, 1984, p. 57.
৩২. তদেব
৩৩. B. K. Thapar, 'Synthesis of the multiple data as obtained from Kalibangan' in D. P. Agrawal and A. Ghosh, ed, *Radiocarbon and Indian Archaelogy*, Tata Institute of Fundamantal Research, Bombay, 1973, p. 273.
৩৪. কালিবঙ্গান বসতির অবসানের জন্য শক্তির পরিমাপ না করা রেডিওকার্বন তারিখ হল ১৬৬৫—খ্রীঃ পূঃ ১১০
৩৫. Bridget and Raymond Allchin, *The Rise of Civilization in India and Pakistan*, Select Book Service Syndicate. New Delhi, 1983, p. 303.
৩৬. *EIA* , I, p. 188.

৩৭. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
৩৮. তদেব, পৃ. ৫৩, প্রাচীনকালে গোল অথবা আয়তাকৃতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।
৩৯. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ১৩শ. ৮.১.৫
৪০. Parpola, 'The Coming of the Aryans, পৃ. ১৫২
৪১. তদেব, পৃ. ১৪৬-৪৭
৪২. তদেব, পৃ. ১৫১-৫২
৪৩. তদেব, পৃ. ১৫১
৪৪. *EIA*, II, p. 26.
৪৫. V. Tripathi, 'Early historic archaeology and radiocarbon dating, *The Indian Historical Review*, vol. XIV, 1987, Nos, 1-2, p. 27.
৪৬. *EIA*, II, p. 26.
৪৭. তদেব, পৃ. ২৯৮
৪৮. তদেব, পৃ. ১১০
৪৯. Parpola, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬-৪৭
৫০. তদেব, পৃ. ১৪৬
৫১. তদেব
৫২. L. J Hamsen, 'Death and the Indo-Europeans: Some traditions', *JIES*, vol. 8, Nos 1-2, 1980, pp. 1, 39.
৫৩. মতটি উদ্ধৃত Giorgio Stacul দ্বারা: 'Cremation graves in northwest Pakistan and their Eurasian connection: Remarks and hypotheses', *East and West*, IS MEO, Rome, NS, vol. 21, Nos 1-2, 1971, p. 10.
৫৪. নিউদিল্লী ইনস্টিটিউট অফ্ আরকিওলজিতে ১৯৯৪ এর ২৭ এপ্রিল তারিখে রিচার্ড মিডো কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
৫৫. Renou, *Vedic India*, pp. 118-19.
৫৬. *SBE*, vol XXI. *The Zend Avesta* pt. 3, tr. L. A. Mills, Motilal Banarasidas, Delhi, 1988, Introduction p. XXXI fr. 2.
৫৭. তদেব
৫৮. Marija Gimbutas, 'The social structure of old Europe', *JIES*, vol. 18, Nos. 3-4, p. 226 and Fig. 1 on p. 227.
৫৯. তদেব, পৃ. ২২৬
৬০. Dani and Masson, ed. *History of Civilizations*, I, pp. 187, 189.
৬১. *Stacul*, 'Cremation graves in north-west Pakistan.' p. 12.
৬২. তদেব, পৃ. ১০
৬৩. Marija Gimbutas, *Bronze Age Cultures in Central Asia and Eastern Europe*. Mouton, The Hague, 1965, p. 542.
৬৪. Porpola, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
৬৫. তদেব, পৃ. ১৫৭
৬৬. Macdonnell and Keith, *Vedic Index* I. pp. 8-9; II. p. 175 with fn. 12.
৬৭. *The Iliad*, Bk XXIII, pp. 413-17.

৬৮. তদেব, পৃ. ৪১৮-১৯
৬৯. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
৭০. Hansen, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
৭১. তদেব, পৃ. ৩২-৩৩
৭২. Parpola, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৭৩. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
৭৪. তদেব, পৃ. ২৩০
৭৫. Sankalia, *PPIP*, p. 330.
৭৬. John Marshall, *Mahenjodaro and the Indus Civilization*. vol. I. Arthur Probsthain, London 1931, p. 89.
৭৭. তদেব, পৃ. ৭৯
৭৮. তদেব, পৃ. ৮১
৭৯. M. S. Vats, *Excavation at Harappa*, I, Government of India, New Delhi, 1940, pp 254-71, table on p. 252.
৮০. তদেব, পৃ. ২৫৩, পাদটীকা
৮১. Marshall, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৮২. Vats, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১
৮৩. Marshall, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
৮৪. তদেব, পৃ. ৮৬
৮৫. Vats, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫
৮৬. *EIA*, I, pp. 266, 290.
৮৭. Sinha an Verma, *Sonpur Excavations*, p. 8. *IAR* 1968-69, p.5. and *EIA*, I, p. 98 Sinha and Roy, *Vaishali Exacavtions, 1958-62*, pp. 16-22; *EIA*, II, p. 247, 270, 271, 365, 398, A. Ghosh, 'Rajgir, 1950', *Ancient India*, No. 7, January, 1951, pp. 69-70.
৮৮. *ঋগ্বেদ*, ৭ম, ৮৯, ১; *ঋগ্বেদ সংহিতা*, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, পুনা, ১৯৩৩-৩৫, অথর্ববেদ ৫ম, ৩০.১৪; *অথর্ববেদ সংহিতা*, অনুবাদ ডব্লু, ডি. হুইটনি, হার্ভার্ড অরিয়েন্টাল সিরিজ, হার্ভার্ড, ১৯০৫
৮৯. *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ১৩শ, ৮.১.৪
৯০. *ঋগ্বেদ*, ১০ম, ১৬.৪
৯১. *অথর্ববেদ*, ১২শ, ২.৪৮
৯২. *The Iliad*, BK. XXIII, p. 417.
৯৩. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*, সম্পাদনা জি. বুহ্লার, গভঃ সেন্ট্রাল বুক ডিপো, বোম্বাই, ১৮৯২-৯৪, ২য়, ৭.১৬. ৭.১৭৩; ৮ম, ১৯.১৩-১৫

পঞ্চম অধ্যায়

১. Benvenisto, *Indo-European Language*, pp. 175-76.
২. W. A. Hunter, *Introduction to Roman Law*. London. 1934, p. 24.

৩. *মনুস্মৃতি বা মানবধর্মশাস্ত্র*, সম্পাদনা ভি. এন. মণ্ডলিক, গণপত কৃষ্ণজীর মুদ্রণালয়, বোম্বাই, ১৮৮৬, ৮ম, ৪১৬
৪. R. S. Sharma, *Perspectives in Social and Economic History of Early India.* Munshiram Manoharlal, Delhi, 1983, p. 48.
৫. Mallory, *In Search of the Indo-Europeans,* p. 244.
৬. তদেব, পৃ. ২০৫
৭. তদেব, পৃ. ২৩০
৮. তদেব, পৃ. ৫৩
৯. তদেব, পৃ. ২৫০
১০. তদেব, পৃ. ১৮৪
১১. তদেব, পৃ. ৯৩
১২. Colin Rerfrew. *Archaeology and Language*: The Puzzle of Indio-European origin, Penguin, Harmondsworth, 1989, pp. 205-10.
১৩. R. S. Sharma, *Material Culture and Social Formations in Ancient India,* Macmillan, New Delhi, 1992, pp. 22-55.
১৪. *SBE.* XXI. *The Zend Avesta,* Pt. III. tr, L. H. Mills. Motilal Banarasidas, Delhi, reprint, 1988, pp. 43,49,73,173.
১৫. *Subvoce,* 'ayas', Monier-Williams, *Sanskrit-English Dictionary,* Motilal Banarasidas, Delhi, 1986.
১৬. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
১৭. Andrew Sherratt, 'Plough and pastoralism: Aspects of the secondary products revolution', I. Hodder etal eds, *Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke,* Cambridge, 1981, pp. 261-305; Ardrew and Susan Sheratt, 'The Archaeology of Indo-European: An Alternative view', *Antiquity,* vol. 62, No. 236, 1988, pp. 584-95.
১৮. Mallory, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭-২০৬
১৯. তদেব, পৃ. ১৯৮-৯৯
২০. তদেব, পৃ. ১৯৯
২১. তদেব, পৃ. ২১০-১৫
২২. তদেব, পৃ. ২২৮-২৯, অ্যালেগ কুজমিনার মত উদ্ধৃত।
২৩. তদেব, পৃ. ২২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. Dani, *Ancient Pakistan,* V, 1970-71, p. 50, quoted in Sankalia, *PPIP.* p. 330.
২. ঋগ্বেদ, ১০ম, ৮৭.২২
৩. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, ২৩শ, ১-২

৪. Harmatta in Dani and Masson, *History of Civilizations*, I, p. 375.
৫. ম্যাক আলপিনের মত উদ্ধৃত ম্যালরির দ্বারা : *In Search of the Indo-Europeans*, pp. 44-45.
৬. Mallory, পূর্বোক্ত
৭. অগ্নিবেদী সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।
৮. A. L. Basham, *The Origins and Development of Classical Hinduism*, Oxford University Press, New Delhi, 1990, p. 4.
৯. এটি এ. ম. শাস্ত্রীর মত। এই মত যে সব লেখায় প্রকাশিত তা বর্তমানে আমার হাতের কাছে নেই।
১০. R. S. Sharma, *Material Culture and Social Formations in Ancient India*, Delhi, Macmillan, 1992, Chapters IV and V.

৮. S.B. Roy : Lanka of Ravana, N. Delhi, Pg

গ্রন্থপঞ্জী

Argrawal, D. P., *The Archaeology of India*, Select Book Service Syndicate, New Delhi, 1984.

Aitreya Brahmana with the Commentary of Sayana, ed. T. Weber, Bonn, 1879, Tr. Martin Haug. Bombay, 1863, Tr. as *RgVeda, Brāhmanas: Aitareya* and *Kausītaki Brāhmanas* by A. B. Keith, Harvard Oriental Series, XXV, Harvard, 1920.

Allchin, Bridget and Raymond, *The Rise of Civilization in India and Pakistan*, Select Book Service Syndicate, New Delhi, 1983.

Anthony, David W., 'Thw "Kurgan Culture", Indo-European origins, and the domestication of the horse: A reconsideration', in *Current Anthropology*, 27, No. 4, Aug-Oct, 1986, pp. 291-313.

Apastamba Dharmasūtra, ed, G. Buhler, Government Central Book Depot, Bombay, 1982-94

Atharva Veda Samhitā (School of the Saunakas), ed, C. R. Lanman, tr. W. D. Whitney, Harvard Oriental Series, VII-VIII, Harvard University, Harvard, 1905.

Bailey, H. W., 'Iranian *arya* and *daha*', in *Transactions of the Philological Society*, 1959, pp. 71-83.

Basham, A. L., *The Origins and Development of Classical Hinduism*, Oxford University Press, New Delhi, 1990.

Benveniste, E., *Indo-European Language and Society*, Faber and Faber, London, 1973.

Bongard-Levin, G. M., *The Origin of Aryans from Scythis to India*, Arnold-Heinemann, New Delhi, 1980.

Burrow, T., *The Sanskrit Language*, Faber and Faber,. London, 1955.

'The Proto-Indo-Aryans', in *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1973, pp. 123-40.

Buck, Carl D., *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages*, University of Chicago Press, Chicago, 1949.

The Cambridge Ancient History, vol. I. Part I, 3rd edn, ed. I. E. S. Edwards, C. J. Gadd and N. G. L. Hammond, Cambridge University Press, Cambridge, 1970; Part II, 1971.

Cardona, G. H. M. Hoenigswald and A. Senn, eds, *Indo-European and Indo-Europeans*, Pennysylvania Press, Philadelphia, 1970.

Childe, V. G., *The Aryans*: A Study of Indo-European Origins, Kegan Paul, Trench and Trubner, London, 1926.

Dani, A. H., *Recent Archaeological Discoveries in Pakistan,* UNESCO and The Centre for East- Asian Cultural Studies, Tokyo, 1988.

Dani. A. H. and V.M. Masson, *History of Civilizations in Central Asia,* I, UNESCO Publishing, Paris, 1992.

Deva, K. and Vijayakanta Mishra, *Vaishali Excavations* : 1950, Vaishali Sangha, Vaishali, 1961.

Diakonov, I. M., 'On the original home of the speakers of Indo-European', in *Journal of Indo-European Studies* (abbrev. JIES, 13, 1985, pp. 92-201.

Fairservis Jr., Walter, A., *The Roots of Ancient India,* George Allan and Unwin, London, 1971.

Francfort, Henry-Paul 'New data illustrating the early contacts between Central Asia and the north-west of the Subcontinent, in *South Asian Archaeology* 1989, ed. C. Jarrige, Prehistory Press, Madison, 1992, pp. 97-102.

Gaur, R. C., *Excavation at Atranjikhera. Early Civilization of the Upper Ganga Basin,* Motilal Banarasidas, Delhi, 1983.

Gening. V. J., 'The Cemetery at Sintashta and the early Indo-Iranian peoples', in *JIES,* 7, 1979, pp. 1-29.

Ghosh, A., 'Rajigir 1950', in *Ancient India,* No. 7, January 1951, pp. 66-78.

Ghosh, A. ed., *An Encyclopaedia of Indian Archaeology* (abbrev. EIA), in 2 vols., Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1989.

Gimbutas, Marija, *Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe,* Mounton, The Hague, 1965.

'The Kurgan wave 2 (c. 3400-3200 BC) into Europe and the following transformation of culture', in *JIES,* 8, Nos, 3 and 4, 1980, pp. 273-315.

'Comments' on David W. Anthony, 'The Kurgan culture', Indo-European origin and the domestication of the horse: A reconsideration', in *Current Anthropology,* 27, No. 4, Aug.-Oct. 1986.

'The social structure of old Europe', in *JIES,* 18, Nos, 3-4, 1990, pp. 225-284.

Gnoli, Gherado, *The Idea of Iran: An essay on its origin,* Institute Italiano per II Medio Ed Estremo Oriente, Rome, 1989.

Gurney, O. R., *The Hittites,* Allen Lane, London, 1975.

Habib, Irfan and Faiz Habib, 'The Historical Geography of India, 1800-800 BC', in *Proceedings of the Indian History Congress,* 52nd Session, K. M. Shrimali, Secretary, Indian History Congress, Department of History, University of Delhi, New Delhi, 1991-92, pp. 72-97.

Indian Archaeology-A Review, (abbrev. IAR), 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 and 1988-89.

Archaeological Survey of India, Government of India, New Delhi.

Hansen, L. J. 'Death and the Indo-Europeans: Some traditions', in *JIES,* 8, Nos, 1-2, 1980, pp. 31-40.

Hunter, William A., *Introduction to Roman Law,* London, 1934.

The Iliad of Homer, tr. E. V. Riey, reprint, Penguin, Harmondsworth, 1986.

Joshi, J. P., *Excavation at Bhagwanapura* 1975-76, Archaeological Survey of India, Government of India, New Delhi, 1993.

Excavation at Surkotada and Exploration in Kutch, Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 87, Archaeological Survey of India, Government of India, New Delhi, 1990.

Kane, P.V., *History of Dharmasāstra,* vol. II. Pt. 2, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974.

Lal B. B., 'Same reflections on the structual remains at Kalibanga', in B. B. Lal and S. P. Gupta eds., *Frontiers of the Indus Civilization,* Books and Books, New Delhi, 1984, pp. 55-62.

'The Painted Gray Ware Culture of the Iron Age', in A. H. Dani and V. M. Masson, *History of Civilizations in Central Asia,* UNESCO Publishing, Paris, 1992, pp. 421-440.

Lincoln, Bruce, *Priests, Warriors and Cattle,* University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1982.

Macdonell, A. A. and A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects,* vols, I and II, Indian Text Series, London 1922, reprint, Motilal Banarasidas, Delhi, 1967.

Mallory, J. P., *In Search of the Indo-Europeans Language,* Archaeology and Myth, Thames and Hudson, Paperback edn, London, 1991.

Manu Smrti or *Mānava Dharmasātra,* Ed. V. N. Mandlik, Ganpat Krishnaji's Press, Bombay, 1886.

Marshall, Sir, John, ed., *Mohenjo-daro and the Indus Civilization,* 3 volumes, Arthur Probsthain, 41 Great Russel Street, London, 1931.

Monier Williams, M. A, *Sanskrit-English Dictionary,* Oxford University Press, reprint, Motilāl Banarsidass, Delhi, 1986.

Narain, A. K., 'On the first Indo-Eurpoeans: The Tokharian-Yuezhi and their Chinese homeland', in *Inner Asia,* No. 2. Indian University Research Institute for Inner Asian Studies, Bloomington, 1987.

Narain, A. K. and T. N. Roy, *Excavations at Rajghat*, part II, Banaras Hindu University, Varanasi, 1977.

Narain, A. K. and T. N. Roy, *The Excavations at Prahladpur* (March-April 1963), Banaras Hindu University, Varanasi, 1968.

The Odyssey of Homer, tr. E.V. Rieu, reprint, Penguin, Harmondsworth, 1986.

Parapola, A., 'The Coming of the Aryans of Iran and India and the cultural and ethnic identity of the dasas', in *International Journal of Dravidian Linguistics*, XVII, No. 2, pp. 85-228.

Poliakov, L, *The Aryan Myth : A history of racist and nationalist ideas in Europe*, tr. Edmund Howard, Chatto Heinemann for Sussex University Press, London, 1974.

Possehl, G. L. and Paul C. Rissman, 'India' in *Chronologies in Old World Archaeology*, third edn, ed. Robert W. Ehrich, The University of Chicago Press, 1992.

Rao, S. R., *Lothal and the Indus Civilization*, Asia Publishing House, Bombay, 1973.

Lothal : normel A Harappan port-town (1955-62).

Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 78, Archaeological Survey of India, Government of India, New Delhi, vol. I, 1979, vol. II, 1985.

Renfrew, C., *Archaeology and Language : The puzzle of Indo-European origins*, Penguin, Harmondsworth, 1989.

Renou, L., *Vedic India*, Indological Book House, Varanasi, 1971.

Rgveda Samhita with the commentary of Sayana, 5 vols, Vaidik Samshodhan Mandal, Poona, 1933-35. Tr. of the first six Mandalas, H.H. Wilson, London, 1850-57. Tr. under the title *The Hymns of the RgVeda* Ralph T.H. Griffith. reprint, Motilal Banarasidas, Tr. in German, K. F. Geldner, Delhi, 1986, *DerRig-Veda*, Hos, XXXIII-XXXVI, Cambridge, Massachusetts, 1951-57.

Roux, G., *Ancient Iraq*, second edn, Penguin, Harmondsworth, 1980.

Sankalia, H. D., *The Prehistory and Protohistory of India and Pakistan*, (abbrev. PPIP), new edn, Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona, 1974.

Śatapatha Brāmana (Madhyandina recension), ed. V. Sharma Gauda and C. D. Sharma, Kasi, Samvat 1994-97. tr. J. Eggeling, *Sacred Books of the East Series*, (abbrev, SBE), XII, XXVI, XLI, XLIII and XLIV, reprint, Motilal Banarasidas, Delhi, 1963.

Shaffer, J. G., 'Indus Valley, Baluschitan and the Helmand', in *Chronologies in Old World Archaeology*, third edn, ed. Robert, W. Ehrich, vol, I, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1992.

Shamra, R. S., *Perspectives in Social and Economic History of Early India*, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1983.

Material Culture and Social Formations in Ancient India, Macmillan, Delhi, 1992.

Origin of the State in India, University of Bombay, Bombay, 1989.

Sudras in Ancient India, third edn, Motilal Banarasidass, Delhi, 1990.

Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India, third edn, Motilal Banarasidass, Delhi, 1991.

Sherratt, A., 'Plough and Pastoralism: Aspects of the Secondary products revolution', in I. Hodder, G. Isaac and N. Hammond, eds. *Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp. 261-305.

Sherratt, Andrew and Susan Sherratt, 'The Archaeology of Indo-European: An alternative view', in *Antiquity*, 62, No. 236, No. 236, 1988, pp. 584-95.

Singh, P. and M. Lal, 'Narhan: 1983-85-A Preliminary report of Archaeological Excavations', in *Bharati*, NS, No. 3, 1985, pp. 120-121.

Singh, P., *Excavations at Narhan* (1984-89), Banaras Hindu University and D. K. Publishers, New Delhi, 1994.

Sinha, B. P. and B. S. Verma, *Sonpur Excavations* (1956 and 1959-62), Directorate of Archaeology and Museums, Bihar, Patna, 1977.

Sinha, B. P. and S. R. Roy, *Vaishali Excavations* 1958-62, Directorate of Archaeology and Museums, Bihar, Patna, 1969.

Sinha, B. P. and L A. Narain, *Pataliputra Excavations*, Directorate of Archaeology and Museums, Bihar, Patna, 1970.

Smith, Morton R., 'What is in a name (in ancient India)?', In *JIES*, 12, 1984.

Stacul, G, 'Cremation graves in northwest Pakistan and their Eurasian connections: Remarks and hypotheses', in *East and West*, ISMEO, Rome, New Series, 21, Nos, 1-2 (March-June 1971), pp. 9-19.

Prehistoric and Protohistoric Swat, Pakistan (c. 3000-1400 BC), ISMEO, Rome, 1987.

'Swat, Pirak, and connected problems (mid-2nd millennium BC)' in *South Asian Archaeology* 1989, ed. Catherine Jarrige, Prehistory Press, Madison, 1992, pp. 267-270.

Thapar, B. K. 'Synthesis', in D. P., Agrawal and A. Ghosh, ed., *Radiocarbon and Indian Archaeology*, Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, 1973, pp. 264-71.

Tripathi, Vibha, 'Early historic archaeology and radiocarbon dating', in *The Indian Historical Review*, XIV, Nos. 1-2, 1987, pp. 20-35.

Turner, R. L., *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages*, Oxford University Press, London, 196[illegible]

Vats, M. S., *Excavations at Harappa*, 2 vols, Government of India, Delhi, 1940.

Voigt, M. and R. H. Dyson, 'Iran' in *Chronologies in Old World Archaeology*, third edn, ed. Robert W. Ehrich, vol. I, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1992.

The Zend Avesta, Pt. I, *The Vendiad,* tr. James Darmesteter, *SBE,* vol. IV, reprint, Part II, tr. James Darmesteter, *SBE,* vol. XXIII, reprint, Motilal Banarasidass, Delhi, 1998. Pt. III, tr. L.H. Mills, *SBE,* XXXI, reprint, Motilal Banarasidass, Delhi, 1988.

Zvelebil Marek and Kamil V., 'Agricultural Transition and Indo-European dispersals', in *Antiquity,* 62, NO. 236, Sept, 1988. pp. 574–583.